Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীশিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চেলেন্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার

রোলঃ 23090121466

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীশিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চেলেন্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার

রোলঃ 23090121466

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীশিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চেলেন্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লিজা আক্তার, আইডিঃ 23090121466 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারীশিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চেলেনজ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোসাঃ লিজা আক্তার

(স্বাক্ষর)

লিজা আক্তার

আইডিঃ 23090121466

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা : 7

পরিচ্ছেদ-১:-দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত :- 9

১.১:-ইলমের পরিচয় : 9

১.২:-ইল্মের গুরুত্ব ও ফযীলত :..10

১.৩-দীনী ইলম হাসিল করার আদব:- 16

পরিচ্ছেদ ২ - কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষারগুরুত্ব 18

২.১ জ্ঞান অর্জন একটি আবশ্যকীয় কাজ - 20

২.২ শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা :-...23

২.৩ নারীশিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা ~ 29

২.৪:- শিক্ষা সম্পর্কে হাদিসের নির্দেশ -..31

২.৫:-হাদিসে নারীশিক্ষার নির্দেশ- 33

পরিচ্ছেদ ৩: - ইসলামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব -..35

৩.১- ইসলামে নারীর মূল্যায়ন 38

৩.২ আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভুমিকা 39

৩.৩- দ্বীনি শিক্ষা না করার ক্ষতি 40

৩.৪সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম :..42

পরিচ্ছেদ -৪:- নারীশিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :-............................43

৪.১-নারীশিক্ষায় পশ্চিমা ধারনা ও ইসলামিক ধারণার পার্থক্য - 44

পরিচ্ছেদ ৫: –যুগে যুগে নারীশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ -...................................48

৫.১ -মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নারীশিক্ষা -..................48

৫.২-সাহাবীদের যুগে নারীশিক্ষা :- 52

৫.৩-তাবেয়ীদের যুগে নারীশিক্ষা :- 56

৫.৪-উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারীশিক্ষা :- 59

৫.৫-ঐতিহাসিক উদাহরণ :- 61

পরিচ্ছেদ ৬:- জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের ভুমিকা। কুরআন ও হাদিস চর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান।..64

পরিচ্ছেদ ৭ :সহশিক্ষা,নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, চ্যানেন্জ সমাধান ওপ্রসারের উপায় -..71

উপসংহার :- 90

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভুমিকা :

আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা তার সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কিতাব আল কুরআন এ সর্ব প্রথম যে আদেশ টা দিয়েছেন সেই আদেশ টা নামাজ পড়ার বেপারে নয়, সেখানে যাকাত দেয়ার কথা বলেননি রোজা রাখার কথা বলেন নি, প্রথমেই যে পথ নির্দেশ আল্লাহর তরফ থেকে অবতরর্ণ হয়েছে তা হল اقرا অর্থাৎ পাঠ কর, ঘোষণা কর, পুনরাবৃত্তি কর। এখানে নারী বা পুরুষ কাউকে নির্দিষ্ট করে বলেনি। বরং উভয়কেই বুঝিয়েছে।

ইসলামে নারী শিক্ষা অপরিহার্য। যেমন পুরুষের জন্য অপরিহার্য। তবে উভয়ের জন্য শিক্ষার পরিবেশ হবে ভিন্ন এবং উভয়ের উপযোগী শিক্ষা সিলেবাস হবে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। তবে উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হবে একই। আর তা হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হবার পর ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু উভয়কে প্রথমে জানতে হবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে। অতঃপর জানতে হবে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য। অতঃপর সে তার কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। উভয়ের আবেগ-অনুভূতি পৃথক। তাই দু'বছরের শিশুর মধ্যেও দেখা যাবে যে, তাদের খেলনা পৃথক, পোষাক পৃথক ও খেলার সাথী পৃথক। দেখবে যে তাদের রুচি ও দাবীও পৃথক। কন্যা শিশু বাইরে যেতে চায় না। সে হাড়ি-পাতিল নিয়ে খেলে। ছেলে শিশু ঘরে থাকতে চায় না। সে বাস-ট্যাক্সির খেলনায় মেতে থাকে। মেয়ে শিশু বাপের বেশী আদরের হ'লেও মায়ের কোলে ঘুমাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ঠিক এভাবেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী ছোট থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। সেই সঙ্গে দিতে হবে অনুকূল পরিবেশ। মাছ যেমন পানির মধ্যে স্বাধীন। মেয়েরা তেমনি পর্দার মধ্যে স্বাধীন। ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকে তাদের বিপরীত পরিবেশে বিব্রত বোধ করে। একইভাবে টাইট-ফিট অর্ধনগ্ন পোষাকে তারা উভয়ে সংকুচিত হয়। কিন্তু ঢিলা পোষাকে ও বোরকা-ম্যাক্সির মধ্যে উভয়ে স্বস্তিবোধ করে ও খোলা মনে চলাফেরা করে। এর বিপরীত কিছু করতে গেলেই সেটা হয় তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। যাতে ঘটে নানা বিপত্তি। ইসলাম নারী ও পুরুষের এই স্বভাবগত প্রবণতাকে সম্মান দেখিয়েছে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। দেশের ও মানবতার কল্যাণকামী যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামের এই মঙ্গলময় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তেই হবে। যার কোন বিকল্প নেই।

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি তাওহীদ সম্পর্কে জানলেই শিশুমনে ভেসে ওঠে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্তের কথা।

সে তার কাছে প্রার্থনা করে বলে, "*রবিব যিদনী ইলমা* 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ১১৪)*।

সে তার পাঠ শুরু করে" *বিসমিল্লাহ"* বলে এবং শেষ করে "*আলহামদুলিল্লাহ"* বলে। অতঃপর যে নিষ্পাপ রাসূলের মাধ্যমে সে তার স্রষ্টার বিধান পেয়েছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর সে "ঈমানে মুফাচ্ছাল ও ঈমানে মুজমাল" শিখে নেয় এবং আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতামন্ডলী, আল্লাহর কিতাব, বিচার দিবস ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় এবং জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয়। এতে তার হৃদয় সর্বদা পরিশুদ্ধ থাকে। এভাবে যখন শিশুর মানস জগত গড়ে ওঠে, তখন একে একে সে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে থাকে। যে জ্ঞান তার ইহকাল ও পরকালকে সমৃদ্ধ করে।

বস্তুতঃ যে ইলম মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, সেটাই হ'ল প্রকৃত ইলম। সেই ইলম শিক্ষা করা নারী ও পুরুষ প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪)*। যে ব্যক্তি উক্ত ইলম শেখার জন্য রাস্তা তালাশ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*। এমনকি তার জন্য ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেন *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪১)*।

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১)*।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, 'এক ঘণ্টা দ্বীন শিক্ষায় রাত্রি জাগরণ সারা রাত্রি ইবাদতের চাইতে উত্তম' *(দারেমী হা/৬১৪)*। ঐ ইলম কেবল তার জীবদ্দশাতেই কল্যাণ দেয় না, মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় জারি থাকে *(মুসলিম হা/১৬৩১)*।

যে ইলম আদমকে ফেরেশতাদের উপরে স্থান দিয়েছিল সে ইলম ছিল তাওহীদের ইলম। আজও সেই ইলমই মানুষকে সৃষ্টিজগতের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিবে। এর বিপরীত ঈমানহীন শিক্ষা হ'ল শয়তানী শিক্ষা। যার ধোঁকায় পড়ে আদমকে জান্নাত হারাতে হয়েছিল। আজও মানুষকে জান্নাত হারাতে হবে এবং দুনিয়া অকল্যাণে ভরে যাবে। যেমনটি এখন হচ্ছে। আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র নারী নেতৃত্ব দেখা গেলেও নারী নির্যাতনে বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের খবর সমূহ মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। যার কোন তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৮ সালের সর্ব সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংস্থা 'জাতিসংঘে' নিযুক্ত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার। লোক-লজ্জার ভয়ে যেগুলি প্রকাশ পায় না,

তার হিসাব এর বাইরে। খৃষ্টান পোপ-পাদ্রী ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের নারী নিগ্রহ তো মিডিয়ায় শিরোনাম হচ্ছে অহরহ। ইভটিজিং ও নারী ধর্ষণ তো এখন বাংলাদেশের নিয়মিত খবরে পরিণত হয়েছে। অথচ শিক্ষায় ও ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ এখন সবচেয়ে বেশী। এরপরেও নারী নির্যাতনের এই চিত্র কেন? একটাই উত্তর আসবে, আর তা হ'ল শিক্ষার নামে চলছে বস্তুবাদী শিক্ষা বা ঈমানী শিক্ষাহীন ইবলীসী শিক্ষা। যা তাকে কেবল অর্থোপার্জন শিখায়, নেকী অর্জন শিখায় না। সে ধনী হয়, কিন্তু সুখী হয় না।

নারী শিক্ষা এমন হ'তে হবে, যাতে সে সেরা সম্পদে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, দুনিয়া পুরাটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ'ল পুণ্যশীলা নারী *(মুসলিম হা/১৪৬৭)*। তিনি বলেন, সোনা-রূপার চেয়ে মূল্যবান হ'ল ঐ স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করে *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬)*। অতএব নারীকে নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। যথা : (১) সে শরী'আতের পূর্ণ পাবন্দ হবে (২) তার যবান সংযত হবে (৩) শারঈ পর্দায় অভ্যস্ত হবে (৪) স্বামীর অনুগত হবে। (৫) সন্তান প্রতিপালনে আন্তরিক হবে। (৬) সৎকর্মশীল মহিলাদের সাথে উঠাবসা করবে। (৭) কুরআন ও হাদীছে দক্ষ হবে। (৮) নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বদা গৃহে অবস্থান করবে। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আল্লাহ বণ্টন করে দিয়েছেন। পরিবারে ও সমাজে পুরুষ হবে কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৩৪)*। পুরুষ পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী হবে সংসার ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে *(বুঃ মুঃ)*।

পরিচ্ছেদ-১:-দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত :-

মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানহীন অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের করেছেন (নাহল ১৬/৭৮) ৷ অতঃপর তাকে অল্প ইল্ম দান করা হয়েছে' (ইসরা ১৭/৮৫) ৷ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়াতে অনেক ইলম রয়েছে, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে দ্বীনি ইলম তথা মানুষের স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে সকল মানুষের জানা আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন দ্বীনী ইলম অর্জনকে ফরয করেছেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রথম অহী ছিল 'পড়'। দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে নিচে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১.১:-ইলমের পরিচয় :

'ইলম' (علم) কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ হ'ল জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি।[ড. মো: ফজলুর রহমান -মু' জামুল ওয়াফি পৃ : ৭০৫] যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم 'বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন'

(ইউসুফ ১২/৭৬)। পরিভাষায় বলা হয়, هو حصول صورة الشئ فى العقل ‘আক্বলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া’।[আল মাওসুল আতুল ফিকহিয়া ৩০/২৯০]

১.২:-ইল্মের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ইলমেরর গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল।-

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، ‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, ‘লিখ’। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই’।[তিরমিজি হা,/ ২১৫৫; সিলসিলা ছহিহাহ হা / ১৩৩]সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ’ল ‘সূরা ক্বলম’। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة ‘তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল’।[হাকেম হা/ ৩৬০;দামেরী হা/৪৯৮]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[বুখারী হা/১১৩] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও’।[বুখারী হা / ১১২]

(২).জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির *(কাহাফ ১৮/৬৫)*, ২. লোকমান *(লোকমান ৩১/১২)*, ৩. ত্বালূত *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*।

(৩).ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ’ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ‘অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে মহান আল্লাহ ‘ঈমান’ ও ‘আমলের’ পূর্বে ইল্ম

অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।[ইবনে মাজাহ হা / ২২৪; ছহীহুল জামে হা / ৩৯১৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[কিতাবুল ইলম - অনুচ্ছেদ ১০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'।[ইবনুল কাইয়ুম ৬৯১-৭৫১ ফাজলুল ইলম ওয়াল উলামা (বৈরুত আল মাকতাব আল ইসলামি১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খৃ:) পৃ:২৯] উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।[ছালেহ আল উছায়মিন, শরহে রিয়াজুছ ছালেহিন ৫/৪১৬]

ফরযে আইন : শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।[কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির) মদিনা ; বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১/১০২৭ পৃ;] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ'ল- ১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।[ফজলুল ইলম ওয়াল ওলামা (বৈরুত:আল মাকতাবুল ইসলামী ১ম প্রকাশ ১৪২২/ ২০০১ খৃ: পৃ;৩০-৩১]

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ- 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

(৪).ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[মুহাম্মদ আসাদুল আল গালিব তাফসিরুল কুরআন সুরা আসর ৩ নং আয়াত তাফসির] আর এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন *(বালাদ ৯০/১০)*, একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর *(ইনসান ৭৬/৩)*। একটি

শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'।... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্ম হ'ল সবকিছুর মূল।[মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসায়মিন ; শরহ রিয়াযাছ ছালেহিন রিয়াদ দারুল ওতান: প্রথম প্রকাশ ১৪২৮ হিঃ৫/৪১৩-৪১৪]

(৫).ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم- 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্ততঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' *(শূরা ৪২/৫২)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ'ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ'ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন,أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِه، 'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' *(আন'আম ৬/১২২)*।[ফাজলুল ইলম ওয়াল ওলামা পৃ:৩২১]

(৬).আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।[মিফতাহু দারিস সাআদাহ পৃ ২]

(৭).ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক জরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[মাদারীজুস সালেকিন ২/৪৭০;ইয়ামুল মুয়াক্কেইন ২/২৫৬]

(৮).ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ'ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'।[আবু দাউদ হা/৩৬৪১;তিরমিজি হা/২৬৮২]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।[ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪;আলবানী সহীহুত তারগীব হা/৮২]

(৯).ইলম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া

কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ’। বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু’টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, ‘আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর’ *(ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)*।[হাফেজ ইবনু কাইয়িম,যাদুল মাআদ ৩/৫৮]

(১০).ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ’ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- ‘নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে ‘হক’-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে’ *(আছর ১০৩/২-৩)*। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ’ল ইলম *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا ‘যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী’।[صحب من ارادالدنيا]

(১১).ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ‘হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ’।[তিরমিজি হা /২৩৪৫;সিলসিলা সহীহ হা /২৭৬৯]

(১২).ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নে‘মত : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে‘মত হ’ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا- ‘আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম’ *(নিসা ৪/১১৩)*। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। আল্লাহ ইলমের মত নে'মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (*ইউসুফ ১২/২২*), মূসা (আঃ) *(ক্বাছাছ ২৮/১৪)*, ঈসা (আঃ) (*মায়েদাহ ৫/১১০*), দাঊদ (আঃ) (*ছোয়াদ ৩৮/২০*), সোলায়মান (আঃ) *(আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)*।

(১৩).মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্ত তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه، 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[মুসলিম হা/৪৩১০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।[ইবনে মাজাহ হা /২৪২;ইবনে খুজাইমা হা/২৪৯০]

(১৪).রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু'দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُم 'তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি'।[বুখারী হা/১৩৫৩]

১.৩-দীনী ইলম হাসিল করার আদব:-

দীনী ইলম হাসিল করার পূর্বে নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। প্রথমত, এই নিয়ত করবে যে, আমি ইলম মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ইলম হাসিল করছি। কারণ ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ইলমের কোন ফযীলত থাকে না। যাদের ইলম আছে আমল নেই তাদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, كمثل الحمار يحمل أسفارا. অর্থ : তারা হল ঐ গাধার মত যার পিঠে এক বোঝা কিতাব রয়েছে।
দ্বিতীয়ত, গলদ নিয়ত দিল থেকে বের করে দিতে হবে। সুতরাং তর্কে বিজয়ী হতে পারব, জ্ঞানের বড়াই দেখাতে পারব, মানুষের কাছে সম্মান পাব এসব নিয়তে ইলম হাসিল করা যাবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار অর্থ : যে ব্যক্তি মূর্খদের সঙ্গে তর্ক করা, আলেমদের সাথে অহংকার করা কিংবা নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার নিয়তে ইলম শিক্ষা করবে সে জাহান্নামে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২৫২)
তৃতীয়ত, এই নিয়তে ইলম হাসিল করবে যে, ইলম অর্জন করে তা অপরকে শিক্ষা দিব এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দিব।

১.৪:-দীনী ইলম হাসিল করার পদ্ধতি

সাধারণত তিন তরীকায় ইলম হাসিল করা যায়।
(এক) ইলম হাসিল করার সবচেয়ে উত্তম তরীকা হল, কোন উস্তাদ থেকে ইলম শিক্ষা করা। মেয়েরা বালেগা হলে কোন গাইরে মাহরাম (যার সাথে দেখা দেয়া জায়েয নয়) পুরুষের সামনে গিয়ে ইলম হাসিল করতে পারবে না। এতে ইলম হাসিল করার সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। বালেগা নারী কোন মাসআলা-মাসাইল শিখতে হলে ভাই, পিতা, স্বামী, পুত্র প্রমুখ মাহরাম ব্যক্তিবর্গ থেকে জেনে নিবে। তাদের জানা না থাকলে তারা কোন আলেম থেকে শিখে এসে তাদেরকে শিখাবে। কোন বিজ্ঞ আলেমা বা মহিলা আলেম পাওয়া গেলে তাদের থেকেও ইলম শিক্ষা করা যাবে।
(দুই) ইলম হাসিল করার আরেকটি পদ্ধতি হল, দীনী কিতাব-পত্র পাঠ করে ইলম হাসিল করা। কিতাব বা বই-পত্র পাঠ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে-
দীনী বিষয় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোনো কিতাব পাঠ করতে হলে যে কোন কিতাব পেলেই বা যে কোন কিতাবের নাম শুনেই তা পাঠ করা যাবে না। বাজারে ধর্মীয় নামে অনেক ধরণের কিতাব পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে এই সব কিতাবই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই যে কোন কিতাব পাঠ করতে হলে সর্বপ্রথম জেনে নিতে হবে সেই কিতাবের লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি না। তিনি হক্কানী বা জ্ঞানী লোক কি না। কোনো অভিজ্ঞ আলেমের

নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সেই কিতাব সকলের পাঠযোগ্য কি না। নির্ভরযোগ্য নয় এ রকম কিতাব-পত্র পাঠ করলে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

দুনিয়াতে সত্য ধর্ম ইসলাম ছাড়াও বহু বাতিল ধর্ম রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য সেসব ধর্মের কিতাব- পত্র পাঠ করা জায়েয নয়। যেমন ইয়াহুদীদের তাওরাত, খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল বা বাইবেল, হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি। শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ না হয়ে এসব গ্রন্থ পাঠ করলে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

দুনিয়াতে অনেক ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের লিখিত বই-পত্র পাঠ করাও ঠিক নয়। এতেও হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে। অনেকে এসব বই পাঠ করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, 'আমরা পড়ে পড়ে শুধু ভালোটা গ্রহণ করব আর মন্দটা পরিত্যাগ করব। এতে অসুবিধা কী?' তাদের এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী বিষয়ে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তা সঠিকভাবে বিচার করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। ফলে মন্দটাকে ভালো মনে করে গোমরাহীর শিকার হয়ে যেতে পারে। তাই বিজ্ঞ আলেমা নয় এমন সাধারণ মহিলাদের জন্য এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়।

কিতাব-পত্র পাঠ করে কোনো বিষয় সন্দেহযুক্ত হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে কিংবা ভালোভাবে বুঝতে না পারলে বার বার পড়ে সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার সেটা পড়তে থাকতে হবে। উস্তাদ থাকলে উস্তাদকে জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করে নিতে হবে। তারপরও বুঝে না আসলে দীনী ইলম সম্বন্ধে বিজ্ঞ আলেম বা আলেমা থেকে বুঝে নিতে হবে। ভালোভাবে না বুঝে সেটা বর্ণনা করা যাবে না।

অনেক মহিলা অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা নিষেধ। এসব পাঠ করলে আল্লাহর দেয়া মূল্যবান সময় অপচয় করার গুনাহ হয়। উপরন্তু এতে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কারও যদি এসব বই পড়ার নেশা হয়ে থাকে তাহলে যত কষ্টকরই হোক, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে মনের চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিছুদিন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ জাতীয় বই-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। এগুলো নিজের আশেপাশেও রাখবে না। একেবারে দূরে সরিয়ে দিবে বা পুড়িয়ে ফেলবে। চেষ্টা করে কিছুদিন এভাবে বিরত থাকতে পারলেই মন থেকে এসব পাঠ করার চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন: চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা করার বৈধতা-অবৈধতা নিয়তের উপর নির্ভর করে। এগুলো যদি দীনের সহযোগিতা, মানুষের কল্যাণ ও সৃষ্টিজীবের সেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় তাহলে তা বৈধ। আর যদি অসৎ পন্থা অবলম্বন ও শোষণ- জুলুমের মাধ্যমে অর্থ হাতানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে হলে মেয়েদের পক্ষে পরপুরুষের সঙ্গে পর্দাহীনভাবে ওঠাবসা ছাড়া সম্ভব হয় না। অথচ পর্দা রক্ষা করা ফরয। পর্দার বিধান রক্ষা না করে এগুলো তো দূরের কথা, শরীয়তে দীনী শিক্ষা অর্জন করারও অনুমতি নেই।

(তিন) ইলম হাসিল করার তৃতীয় পদ্ধতি হল, ওয়ায-নসীহত বা দীনী আলোচনা শুনে ইলম হাসিল করা। তবে কোনো ওয়ায মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে শরীক হতে গিয়ে পর্দার ব্যাঘাত ঘটলে বা কোনো রকম ফেতনার আশঙ্কা থাকলে সেরূপ ওয়াযের মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে যাওয়া জায়েয হবে না। মেয়েদের দীনী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে সৎ, জ্ঞানী, গুণী, নেককার ও পরহেযগার মহিলার মাধ্যমে মহিলা- তা'লীমের মজলিস পরিচালিত হয়ে থাকে। পর্দা রক্ষা করে এরূপ মজলিসে তা'লীম গ্রহণ করতে পারলে অনেক উত্তম। তা'লীম দাতা মহিলা জ্ঞানী না হলে সেখানে না যাওয়া উচিৎ।

ওয়ায়-নসীহতের মজলিস এবং তা'লীমের মজলিস দীনী মজলিস। তাই এরূপ মজলিসে গেলে মজলিসের আদবও রক্ষা করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ২ - কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষারগুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
অর্থ: আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত,আয়াত– ৫৬)
অর্থাৎ– ইবাদত বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত বন্দেগী পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা অপরিহার্য। অর্থাৎ– যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাতগুলো পালন করা সম্ভব নয়, ততটুকু ইলম অর্জন করা প্রত্যকরে জন্য ফরয। যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী–পুরুষ উভয়েই আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও অবশ্যই উভয়ের রয়েছে সমান অধিকার, অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ ও আবশ্যকীয়তা।
যেমনিভাবে হাদিসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ
অর্থাৎ– প্রত্যেক মুসলমান নর–নারীর জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ–১/৩৫৭পৃঃ)
ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, যা কোরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...
অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার–পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা–তাহরীম,আয়াত–৬)
উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন– 'বান্দা নিজেকে এবং সাথে সাথে পরিবার–পরিজন' (তথা–মা–বোন, স্ত্রী–সন্তানদের)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাগিদ দিযেছেন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত–বন্দেগী করতে হবে, আর আল্লাহর বন্দেগী করতে হলে অবশ্যই বান্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম ।
এমনিভাবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, হাদিসে আছে–
عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
অর্থ: একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা (রা.)এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি–পাচড়ার চিকিৎসা পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ–৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে রাসূল (স.)এর উক্তি ‘কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না?’ থেকেই ইসলামে নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়টি প্রতিয়মান হয়।

২.১ জ্ঞান অর্জন একটি আবশ্যকীয় কাজ -

"যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান? নিশ্চয়ই বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।’

আমাদের আলোচনার বিষয় এবং এর আকাঙ্ক্ষিত অর্থ মহানবী (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের ওপর ভিত্তিশীল যে হাদীসের ব্যাপারে শিয়া-সুন্নী উভয় মাজহাবই ঐকমত্য পোষণ করে থাকে। আর তা হলো : ‘প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক (ফরয)।’

এ হাদীস অনুসারে ইসলামের অন্যতম ফরয দায়িত্ব হলো জ্ঞান অর্জন করা। আরবিতে ‘ফারিদাহ’ শব্দের অর্থ বাধ্যবাধকতা অথবা দায়িত্ব এবং এর উৎস হলো ‘ফারাদা’ (একটি আরবি ক্রিয়া)-যার অর্থ কোন কিছু নিশ্চিত হওয়া বা কোন কিছু করতে বাধ্য হওয়া। আমরা যে কাজকে বর্তমানকালে ‘ওয়াজিব’ অথবা ‘মুসতাহাব’ কাজ বলি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই কাজকে ‘মাফরূদ’ (বাধ্যতামূলক) এবং ‘মাসনূন’ (তাকিদযুক্ত) বলা হতো। এখানে এটি অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘ওয়াজিব’ ও ‘উযূব’ শব্দ দু’টি সে সময়েও ব্যবহৃত হতো, কিন্তু ‘ফারিদাত’, ‘মাফরূদ’ এবং ‘ফারাদা’ শব্দের মতো এতটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো না; অন্যদিকে ‘মুসতাহাব’ শব্দটি এর বর্তমান অর্থসহ সম্ভবত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। ‘মুসতাহাব’ শব্দটি পবিত্র কুরআনে কিংবা কোন হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি, এমনকি প্রাথমিক যুগের ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণও তাঁদের লেখায় এটি ব্যবহার করেননি। অতীতকালে তাঁরা ‘মুসতাহাব’ শব্দের পরিবর্তে ‘মাসনূন’ ও ‘মানদূব’ শব্দ ব্যবহার করতেন।"
"

জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক এবং কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা উপশ্রেণীর জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। ইসলামের পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহে জ্ঞান অর্জন কেবল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অধিকারের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ইসলামে জ্ঞান অর্জন একটি বাধ্যতামূলক (ফরয) কাজ এবং নামায আদায় করা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা, হজ্বে যাওয়া, জিহাদে অংশগ্রহণ করা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মতো জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেকের ওপর আবশ্যিক দায়িত্ব। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের সকল মাজহাব এবং সকল পণ্ডিত এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। আর

হাদীসের গ্রন্থাবলীতে ‘বাব-উ উযূব-ই তালাবিল ইলম’ (জ্ঞান অর্জন ফরয হওয়ার অধ্যায়) নামে একটি অধ্যায় রয়েছে।"

"

আমি জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত চারটি হাদীস বলব এবং এগুলোকে ব্যাখ্যা করব।

চারটি হাদীস

১. প্রথম হাদীস

এ চারটি হাদীসের অন্যতম হলো পূর্বে উল্লিখিত ঐ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক। কারণ, হাদীসে বর্ণিত ‘মুসলিম’ শব্দটির অর্থ মুসলমান-সে পুরুষ হোক বা নারী। বিহারুল আনওয়ার ও অন্যান্য গ্রন্থে কয়েকটি হাদীসে ‘মুসলিম’ শব্দের সাথে ‘ওয়া মুসলিমাহ’ (এবং মুসলিম নারী) শব্দগুলোও যুক্ত রয়েছে।

"যা হোক, এ হাদীস অনুসারে জ্ঞান অর্জন করা একটি বাধ্যবাধকতা কর্ম এবং তা কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা শ্রেণির জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এমনও বিষয় থাকতে পারে যা যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু বয়স্কদের জন্য নয়; অথবা শাসকের জন্য কোন একটি বিষয় বাধ্যতামূলক হতে পারে যা শাসিতের জন্য নয় অথবা এর বিপরীতও হতে পারে। আবার কতিপয় দায়িত্ব পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক, অথচ নারীর জন্য নয়; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জিহাদ এবং জুমআর নামায পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক, নারীর জন্য নয়। কিন্তু জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক এবং তা কোন একটি শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট নয়।

2. দ্বিতীয় হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন : ‘দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।’

এর অর্থ হলো জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন সময়কে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং এটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

প্রথম হাদীসটি সকল ধরনের লিঙ্গ ও শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতাকে বাতিল করে দিয়ে এটাকে সর্বজনীন করেছে, আর এই হাদীস কালের দিক থেকে বিষয়টিকে সর্বকালীন করেছে। এমনও হতে পারে যে, কোন একটি ফরয কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং তা অন্য সময়ে সম্পাদন করা অসম্ভব। যেমন রমজান মাসে রোজা রাখার বাধ্য বাধকতা একটি বিশেষ সময় অর্থাৎ রমজান মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রতিদিনের নামাজ সমুহের জন্য ও দিনের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং তা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আদায় করতে হয়। তেমনি হজ্জও একটি ফরজ বিষয় যা কেবল জিলহজ্জ মাসে আদায় করতে হয়। কিন্তু জ্ঞান অর্জন কোন নির্দিষ্ট সময় বা বয়সের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।
"

৩. তৃতীয় হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'চীন থেকে হলেও জ্ঞান অর্জন কর।'২

সম্ভবত হাদীসে চীন দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সেই সময় এটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান যেখানে মানুষ যেতে পারে অথবা এটি বিজ্ঞান ও শিল্পের সূতিকাগার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

এ হাদীস নির্দেশ করে যে, জ্ঞান অর্জন করার বিষয়টি স্থান ও কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সম্ভব যে, একটি ফরয কাজ স্থানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ এবং অন্য কোন স্থানে তা পালন করা যায় না। যেমন হজ্বের বিধানাবলী কাল ও স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ। মুসলমানরা হজ্বের বিধান পালন করে মক্কায়, যেখান থেকে ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিল এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর হজ্ব আদায় করতে হবে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পবিত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক নির্মিত ঘরের পাশে।

মুসলমানরা সকলে একমত হয়ে অন্য কোন স্থানকে হজ্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট করতে পারে না। সুতরাং এই ফরয হলো গণ্ডিভূত। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং যেখানেই জ্ঞান রয়েছে সেখান থেকেই তা অর্জন করতে হবে-তা মক্কা, মদীনা, মিসর, সিরিয়া, ইরাক অথবা বিশ্বের যে কোন দূরবর্তী স্থানই হোক না কেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য দূরবর্তী স্থানে গমন ও হিজরত করার সওয়াবের ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে,এমনকি কুরআনের এ আয়াতটিও এ সম্পর্কেই : 'এবং যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে বহু (নিরাপদ) স্থান ও (ধর্মপালন ও কর্মের ক্ষেত্রে) প্রশস্ততা

লাভ করবে। আর যে কেউ নিজ গৃহ হতে মুহাজির হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরতের উদ্দেশে বের হয়, অতঃপর (লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে) তার মৃত্যু হয়, তবে তার প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।...' (সূরা নিসা : ১০০)

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত'কে জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজরত ও সফর বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে : 'যদি তুমি জানতে যে, জ্ঞান অন্বেষণ ও অর্জনের ফলে তুমি কী সফলতা লাভ করবে, তাহলে তুমি জ্ঞানের পেছনে ধাবিত হতে যদি এ পথে তোমার রক্তও ঝরত অথবা এর জন্য তোমার সাগরে ডুব দেওয়ার এবং মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করারও প্রয়োজন হতো।'"

"

৪. চতুর্থ হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো সম্পদ এবং যে ব্যক্তি কোন কিছু হারিয়েছে, সে যেখানেই তা খুঁজে পায় তা লুফে নেয়।'

'প্রজ্ঞা' শব্দটি একটি দৃঢ়, গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ও যুক্তিপূর্ণ শব্দ যার অর্থ হলো সত্য উদ্ঘাটন করা। যে কোন বিধান যা সত্যের সাথে একমত পোষণ করে এবং যা মনগড়া নয় সেটাই হলো প্রজ্ঞা।

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'একটি জ্ঞানপূর্ণ কথা হলো বিশ্বাসীদের হারানো বস্তু। সুতরাং মুনাফিকের নিকট থেকে হলেও জ্ঞানপূর্ণ কথার উপকারিতা গ্রহণ কর। তোমরা বিশ্বাসীরা এটি অর্জন করার অধিকতর হকদার।'

"

সুতরাং আমাদের যা করতে হবে তা হলো ব্যক্তিগত (ফরজে আইন) অথবা সামষ্টিক দায়িত্ব (ফরজে কেফায়া) হিসেবে কোন দায়িত্ব টি পালন করা,ইসলামে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রথমে সেটা উদঘাটন করা। আর তারপর সেসব দায়িত্ব পালনের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হোক না কেন সেই জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য বাধ্যতামুলক হয়ে যাবে। হোক সে পুরুষ বা নারী।

২.২ শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা :-

- কুরআন ব্যক্তিগত উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সমাজের উন্নতির জন্য জ্ঞানকে অপরিহার্য মনে করে।

- জ্ঞান অন্বেষণকে একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়।
- কুরআনের অনেক আয়াতে চিন্তা, গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে।
- ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস হল কুরআন, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে পথ দেখায়।

কোরআন আমাদের শেখায় যে সুন্দর জীবন কেবল বৈষয়িক সম্পদ বা গ্ল্যামারে নয়, বরং নেক আমল, ইমান, তওবা, হালাল রিজিক, অনাসক্তি ও নেক সঙ্গের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
ফেরেশতাদের সাহায্য, পাপের বোঝা থেকে মুক্তি, রিজিকের বরকত, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং মানুষের ভালোবাসা ও নেক সঙ্গ—এই সবই ইমানদারদের জীবনকে সুন্দর করে। বাইরে থেকে তাঁদের জীবন সাধারণ মনে হলেও আল্লাহ তাঁদেরকে এমন নিয়ামত দান করেন, যা অন্যরা কামনা করেও পান না।
কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি নেক আমল করে, পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ইমানদার হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে সুন্দর জীবন দান করব এবং আখিরাতে তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজের পুরস্কার দেব।' (সুরা নাহল, আয়াত: ৯৭)
এই আয়াতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে।
ক. দুনিয়াতে পুরস্কার: নেক আমল ও ইমানের ফল হিসেবে আল্লাহ দুনিয়াতেই 'হায়াতুন তাইয়্যিবা' বা সুন্দর জীবন দান করেন।
খ. নারী-পুরুষের সমতা: এই পুরস্কার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ইমানদারের জন্য, যা কিছু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে একটি শক্তিশালী বার্তা।
গ. আখিরাতে পুরস্কার: দুনিয়ার এই সুন্দর জীবন ছাড়াও আখিরাতে নেক আমলের ভিত্তিতে আরও উত্তম পুরস্কার অপেক্ষা করছে।
যে ব্যক্তি নেক আমল করে, পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ইমানদার হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে সুন্দর জীবন দান করব।
সুরা নাহল, আয়াত:৯৭

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর মগজে আল্লাহ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম সন্তানেরা

তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।এ মর্মেই মহান আল্লাহ কালামে পাকে সুরা বাকারায় বলেছেন,

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢﴾ [البقرة: ٣١، ٣٢]

‘‘আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’

তাফসীর (মুফতী তাকী উসমানী)

. ‘নামসমূহ’ দ্বারা সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বস্তুর নাম, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মানুষ যে ক্ষুধা, পিপাসা, সুস্থতা, অসুস্থতা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয়, তার জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে এসব বিষয় শিক্ষা দানের সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকলেও তাদের স্বভাবের ভেতর যেহেতু এসব জিনিসের বুঝ-সমঝ ছিল না, তাই তাদের থেকে যখন এর পরীক্ষা নেওয়া হল, তারা উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এভাবে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, এই নতুন সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে কাজ নিতে চান, তা তারা আঞ্জাম দিতে সক্ষম নন। (কেননা খিলাফতের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য খলিফার ভেতর তার মনিব ও অধিকর্তার গুণ থাকা জরুরি। ফিরিশতাগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চস্তরের হলেও মনিবের গুণ অর্থাৎ ইলম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছনে। সেই তুলনায় মানুষকে যেহেতু অনেক এগিয়ে রেখেছেন তাই তাকেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এর দ্বারা ইলমের ফযীলতও বোঝা গেল। -(-অনুবাদক)

কুরআনে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব-

কুরআনে বহু আয়াতে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলো কেবল জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয় না, বরং ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণে জ্ঞানের মূল্যকেও তুলে ধরে।

এখানে কুরআনের কিছু আয়াত দেওয়া হলো যেগুলো শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত:

১. সূরা আল-আলাক (৯৬:১-৫)
ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥ كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦
“পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।”
এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহি, যা পড়া, শেখা ও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে।

২. সূরা আল-বাকারা (২:২৬৯)
﴿ يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩ ﴾ [البقرة: ٢٦٩]
“তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে তো অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।”
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও বোঝাপড়াকে উপহার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৩. সূরা আল-মুজাদিলা (৫৮:১১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُوۡا فِى الۡمَجٰلِسِ فَافۡسَحُوۡا يَفۡسَحِ اللّٰهُ لَكُمۡ‌ۚ وَاِذَا قِيۡلَ انۡشُزُوۡا فَانۡشُزُوۡا يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ‌ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ‌ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়, মজলিসে অন্যদের জন্য স্থান সংকুলান করে দাও, তখন স্থান সংকুলান করে দিও। ৮ আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দেবেন এবং

যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমানদার ও জ্ঞানীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত উচ্চ।

৪. সূরা আজ-জুমার (৩৯:৯)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٪

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নামাজে রত, সেজদায় এবং দাঁড়িয়ে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রভুর রহমতের আশা রাখে — সে কি তার মতো, যে এমন নয়? বলো, যারা জানে আর যারা জানে না — তারা কি সমান? কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"

এই আয়াত জানিয়ে দেয় যে, জ্ঞানীরা অজ্ঞদের সমান নয় — জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব এভাবেই ফুটে ওঠে।

৫. সূরা আলে ইমরান (৩:১৯০-১৯১) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۙ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এটা অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র — অতএব আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'"

এই আয়াত চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টির নিদর্শনের ওপর গবেষণার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৬. সূরা আত-তাওবা (৯:১২২)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٪

"সকল মুমিনের একসাথে (জিহাদ) বের হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক দলের কিছু লোক থাকা উচিত যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করবে এবং যখন তারা ফিরে আসবে তখন তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে যেন তারা সাবধান হয়।"

এটি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ও তা অন্যদের শিক্ষাদানের গুরুত্ব বোঝায়।

৭. সূরা আনকাবুত (২৯:৪৩)
وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ
“আর আমরা মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই তা বোঝে।”
এই আয়াত জানায় যে, কুরআনের উপমাগুলো বোঝার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য।

৮. সূরা আল-জুমু’আহ (৬২:২)
هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ * وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

“তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন, এবং তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ছিল।”
এই আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, যিনি মানুষকে কিতাব ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিয়েছেন।

৯. সূরা আন-নাহল (১৬:৪৩)
وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

“আপনার পূর্বে আমরা কেবল পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমরা ওহি পাঠিয়েছি। যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।”
এটি জানায়, অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও বিশ্বাসযোগ্যদের থেকে জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

১০. সূরা আল-ইসরা (১৭:৩৬) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

“যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কানে, চোখে ও অন্তরে — এসবের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।”
এই আয়াত বলে, সঠিক তথ্য ছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া উচিত — জ্ঞান অনুসন্ধানের গুরুত্ব স্পষ্ট।

১১. সূরা আল-মুমতাহিনা (৬০:৮)

لَا يَنۡہٰـكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يُقَاتِلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ اَنۡ تَبَرُّوۡہُمۡ وَتُقۡسِطُوۡۤا اِلَيۡہِمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ

"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেইসব লোকদের সঙ্গে সদাচরণ করতে যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"

এটি জানায়, এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও ন্যায় ও শিক্ষা বিনিময় করা উচিত।

১২. সূরা আল-আ'রাফ (৭:১৭৯) وَلَقَدۡ ذَرَاۡنَا لِجَـهَنَّمَ كَثِيۡرًا مِّنَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ‌ۖ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا يَفۡقَهُوۡنَ بِهَا وَلَهُمۡ اَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُوۡنَ بِهَا وَلَهُمۡ اٰذَانٌ لَّا يَسۡمَعُوۡنَ بِهَا‌ ؕ اُولٰۤـئِكَ كَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ‌ ؕ اُولٰۤـئِكَ هُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ

"আমি বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে বোঝে না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না; তাদের কান আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে শোনে না। তারা চতুষ্পদের মতো; বরং তারা আরও বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।"

এই আয়াত জানায়, বোঝার ও চিন্তাভাবনার ক্ষমতা — সত্যিকারের জ্ঞানের চাবিকাঠি।

জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤ ﴾ [طه: ١١٤]

"আর আপনি বলুন, 'হে প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'"[15]

এই সব আয়াত একত্রে ইসলাম ধর্মে জ্ঞানের মর্যাদা ও গুরুত্বকে তুলে ধরে। জ্ঞানের অনুসন্ধান কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয় — বরং এটি পৃথিবী, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও আল্লাহর সৃষ্টির বিভিন্ন নিদর্শন উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবেও চিহ্নিত।

২.৩ নারীশিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা ~

একমাত্র ইসলামই নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কারণ ইসলাম মানবরচিত কোনো জীবন-ব্যবস্থা নয়; বরং আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত। আল্লাহ তাআলা সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বপ্রথম নাজিলকৃত বিধান হলো

দ্বীন ইলম শিক্ষা করা যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান ও নীতি যা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই।জাহিলি যুগের পুরুষরা মনে করত ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভিন্নতা আছে। তাদের ধারণা ছিল, পুরুষের ইবাদত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, এর বিনিময়ে আছে সওয়াব। তবে নারীরা এর ব্যতিক্রম, তাদের ইবাদতে সওয়াব নেই। মহান আল্লাহ তাদের এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।’

(সুরা : আল ইমরান, আয়াত : ১৯৫)

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, “তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে।” আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে “তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর।” এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣ ﴾ [البقرة: ٤٣]

“তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।”[সুরা বাকারা-৪৩]এখানে ব্যবহৃত দু’টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর

স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে। আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم: ٦]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।" এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

"তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"

২.৪:- শিক্ষা সম্পর্কে হাদিসের নির্দেশ -

জ্ঞান মহান আল্লাহর এক অনুপম দান, যা মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও জীবনদৃষ্টিকে আলোকিত করে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে এমন কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। "মহানবী (সা.) শুধু তথ্যভিত্তিক জ্ঞান নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণে কাজে লাগে, এমন জ্ঞানের জন্য দোয়া করতেন।"

তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান ও সৎ আমল কামনা করি।' (সুনানে নাসাঈ, হাদিস: ৭,৮১৮)

এই দোয়া জ্ঞানের গুণগত মানের ওপর গুরুত্ব দেয়। উপকারী জ্ঞান মানুষকে আত্ম–উন্নয়ন, সঠিক চিন্তাধারা ও সৎ পথে পরিচালিত করে, যা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে।জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব

কিছু, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত জ্ঞানীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩,৬৪১)

এই হাদিস জ্ঞানার্জনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হন, কারণ তাঁর জ্ঞান সমাজের কল্যাণে কাজ করে।

হাদিস শরীফে এমন বহু সংখ্যক হাদিস রয়েছে যাতে জ্ঞানঅর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

من يردالله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي-

অর্থ- আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বন্টনকারী এবং দাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)। মানব জাতির চরম উৎকর্ষ সাধনকারী ইসলাম। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানঅর্জন কে ফরজ ঘোষণা করেছে। রাসুল (স) ইরশাদ করেন :- طلب العلم فريضةعلي كل مسلم

অর্থ -ইলম অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে হলে অবশ্যই ইলম অর্জন করে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারসমূহ জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে রত থাকে, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা যে কত বেশি নিম্নে বর্ণিত হাদিসটি তার প্রমান। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন -

অর্থাৎ " আমি রাসুলুল্লাহ (স:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি ইলম অন্বেষণের লক্ষ্যে পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন। তালিবে ইলমের কাছে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগন তাঁদের ডানা তাঁদের জন্য বিছিয়ে দেন। আর আলিম এর জন্য আসমান জমিনের সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও। আবিদ ব্যক্তির তুলনায় আলিমের মর্যাদা ঠিক সেরূপ যেমনটি সমস্ত তারকার তুলনায় পূর্নিমার চাঁদের মর্যাদা।আলিমগণ হচ্ছেন নবিগনের ওয়ারিস বা উত্তরাধীকারী। আর নবিগন কাউকে দিনার বা দিরহামের উত্তরাধীকারী করে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকারী করেন ইলমের। যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে প্রভুত কল্যাণ লাভ করল"(আবু দাউদ ও তিরমিজি)।

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত রয়েছে -

أفضل الاعمال العلم لله ان العلم ينفعك معه قليل العمل و كثيره و ان الجهل لا ينفخعك معه قليل العمل و لا كثيره.

অর্থ- "সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ বিষয়ক ইলম (জ্ঞান)। নিঃসন্দেহে ইলম তোমার উপকারে আসবে, চাই তার সঙ্গে অল্প আমল হোক, বা অধিক আমল হোক আর অজ্ঞতা তোমার কোন উপকারে আসবে না, চাই তার সাথে অল্প আমলই থাক বা অধিক আমলই থাক"। (কানযুদ দাকাইক ফি হাদিসি খায়রিল খালাইক, জামি সগীরের পাদটীকা)

নফল ইবাদতের চেয়ে জ্ঞান অর্জন এর গুরুত্ব বেশি। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন -
تدارس العلم ساعة من اليل خير من احياءها
অর্থাৎ “ রাতের এক মুহূর্ত জ্ঞানচর্চা করা পূর্ণ রাত জেগে থাকার চেয়ে উত্তম” (দারিমি)।
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন-
“যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।”(বায়হাকি)
কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ
«من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنّة»
“যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।”[প্রাগুক্ত]
মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
“মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি গভীর ‘ইলম দান করেন।”[বুখারী,কিতাবুল ইলম]
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع»
“যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।”[তিরমিজি - হাদীসটিকে কেও হাসান বলেছেন আবার কেও দুর্বল বলেছেন]
জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের জীবনের দিশারী ও পরকালের সম্বল।এই জ্ঞানের দ্বারাই আল্লাহর সন্তষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যপারসমূহ জানা যায় এবং সে মতে আমল করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করা যায়। অন্যান্য জীবজন্তু ও সৃষ্টির মধ্যে মানুষের পার্থক্য হলো মানুষ জ্ঞানচর্চা করে অন্যরা তা করে না। ফেরেশতাদের উপর ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ হলো জ্ঞান।

২.৫:-হাদিসে নারীশিক্ষার নির্দেশ-

নারীদের শিক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। কেননা, নারী কখনো মা, কখনো বোন, কখনো ছাত্রী আবার কখনো পরিবারের কর্তী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাছাড়া মা ই তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে সুশিক্ষিতা মা স্বভাবতই জ্ঞানী, চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না,

নিষ্ঠাবান, নম্র ও ভদ্র। শিক্ষিত মায়ের এসব গুণ আপনাআপনিই সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

নারীরা শুধু শিক্ষিত নয়, শিক্ষকও হতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন অন্যতম একজন শিক্ষক। এছাড়াও উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী প্রমুখ মহিলা সাহাবিয়ার নাম প্রথম সারিতে এসে যায়। নবী (সা.)-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যা মহানবী (সা.)-এর জীবন থেকে স্পষ্ট। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, একজন নারী নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষেরা আপনার হাদিস শুনছেন, আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারণ করুন, যেন আমরা আপনার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।'

নবীজি (সা.) তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের শিক্ষা দেন। এমনকি তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের আবরণস্বরূপ হবে।' একজন নারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুটি সন্তান মারা গেলেও কি তা–ই হবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, দুটি মারা গেলেও।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০১, ৭৩১০)

এ ঘটনা ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং নারী-পুরুষের সমান শিক্ষার অধিকারকে প্রমাণ করে। শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসুল (সা.) বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরি মনে করা হয়েছে, নারীদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী (সা.)-এর নিকট তালীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত নারীদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ''যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।'

ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে নারী শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে নারীদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)প্রমুখ নারী সাহাবীদের ‘ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা (রা.) -এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে‘য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। এ হাদীসে কুরআনের ‘ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় নারীদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন।

তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা (রা.) সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ‘আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।
অতএব আল্-কুরআন ও সুন্নাহর এই অমোঘ নির্দেশের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারী শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষার অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই ইসলাম নারীকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। কারণ, বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের উচ্চাসন দেবেন বলে আল্লাহ্ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরিচ্ছেদ ৩: - ইসলামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব -

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন। এ মানব সম্প্রদায়কে মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন সাধারনত দুই ভাগে: (১) পুরুষ (২) মহিলা। এর মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে পুরুষকে দিয়েছেন ক্ষেত—খামার, চাকরি—বাকরি, ব্যবসা—বাণিজ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব। তেমনিভাবে মহিলাদেরকেও দিয়েছেন— সন্তান গর্ভে ধারণ করা, লালন—পালন করা, ঘরোয়া বিভিন্ন রকমের কাজ—কর্মগুলো আঞ্জাম দেওয়ার মাধ্যমে পুরুষকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব।

তবে দৈহিক এবং মানসিক ভিন্নতার কারণে দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্মের কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বান্দেগীর ক্ষেত্রে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট।

মহান আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এই জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে' (সূরা জারিয়াত, আয়াত -৫৬)। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার' (সূরা বাকারা: আয়াত-২১)। সেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহপাক একটি শর্ত যুক্ত করেছেন। সেই শর্তটি হচ্ছে ইলিম বা জ্ঞান। ইলম বা জ্ঞান ব্যতীত কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য ইবাদত করার পূর্বে এ সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করা সকলের উপর ফরজ। শিক্ষা লাভ করা থেকে নর-নারী কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। কেউ বিরত থাকতে পারবে না। আল্লাহপাক পুরুষকে যেমন শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন তেমন নারীকেও শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধানে শিক্ষা অর্জন করা নর-নারীর সমান অধিকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কোরআন নাজিল করে মহান আল্লাহপাক সর্ব প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশটাই হচ্ছে নর-নারীর জন্য শিক্ষা বিষয়ক। ইরশাদ হচ্ছে-'পড় তোমার প্রভুর নামে'' (সূরা আলাক: আয়াত-১)। শিক্ষা ছাড়া আল্লাহকে জানা বুঝা যাবে না বিধায় শিক্ষা অর্জন করা প্রথম ও প্রধান ফরজ। এই ফরজ কাজ থেকে বিরত থাকা মানেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনা। মানবতার ইহ-পরকালীন শান্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। আর এই শিক্ষা নর-নারী উভয় কেই অর্জন করতে হবে। ইলম অর্জন করা সকল নর-নারীর উপর ফরজ ঘোষণা করে হযরত আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন- 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ' (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীশিক্ষার বিকল্প নেই। বিশেষ করে একটি পরিবারকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোরআন হাদীস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, নবী সা. সর্ব প্রথম নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এই শিক্ষার বিধান সর্ব প্রথম বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ পান রাসুলে পাক সা. এর প্রিয় সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা.। কাজেই নারী শিক্ষার বিষয়টাকে খাটো করে দেখার

কোনো সুযোগ নেই। অগণিত হাদীস দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত- নবী সা. নিজেই নারীদেরকে শিক্ষাদান করতেন, নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতেন। সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন এমনকি বড় বড় সাহবীগণও নারীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম রা. বর্ণিত হাদীসে আছে- ‘একবার এক মহিলা রাসূল সা. এর দরবারে এসে কিছু বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করলো। বিদায় নিয়ে যাবার সময় রাসূল সা. তাকে বললেন আর জানার মত কিছু থাকলে অন্য সময় জেনে নিও। মহিলাটি আরজ করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনাকে না পাই অর্থাৎ যদি আপনি দুনিয়াতে না থাকেন তখন কি হবে? রাসূল সা. বললেন- আবু বকর রা. এর নিকট তখন শিক্ষা গ্রহণ করিও’ (বুখারী ও মুসলিম, তিরমিজী)। উক্ত হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত- নবী সা. স্বয়ং নিজে নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্য জনের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নারীদেরকে উৎসাহিত করতেন। রাসূল সা. এর যুগে এবং পরবর্তী সময়ে অগণিত মহিয়সী মুসলিম নারী শিক্ষাদান করেছেন এবং তারা শিক্ষকতা করে নিরক্ষরতা দূর করেছেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। হযরত আয়শা রা. ছিলেন হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের এক মহান পন্ডিত। চার খলিফা সহ বড় বড় সাহাবীরা তার নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন- “আমরা রাসূল সা. এর সাহাবীরা যখনই কোন মাসআলার ব্যাপারে সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম তখনই আমরা হযরত আয়শা রা. এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম এবং সঠিক সমাধান পেয়ে যেতাম (তিরমিজী, মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা-৫৭৪)। পুরুষ সাহাবীগণ মহিলা সাহাবীদের নিকট মাসআলা শিক্ষার জন্য যেতেন যা উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে। এর দ্বারা প্রমাণ হলো- মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। তবে শর্ত হলো সর্বদা পর্দা রক্ষা করতে হবে। কেউ যদি পর্দাহীন হয় তাহলে সে তার চরিত্র ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে। আর চরিত্র নষ্ট হলে তো শিক্ষা লাভ করেও লাভ নেই। সাহাবায়ে কেরামগণ (নারী-পুরুষ) শিক্ষার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন, ইলম ব্যাপারে পরস্পর আলোচনা করতেন সত্য কিন্তু এতে পর্দার কোন ব্যাঘাত ঘটতো না। তারা সর্বদা পর্দা রক্ষা করেই চলতেন।

নারীদের জন্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, বরং উচ্চ শিক্ষা লাভ করতেও ইসলামের কোনো বাধা নেই। যদি নারীরা পর্দা রক্ষা করে চলতে পারে। কারণ শিক্ষা অর্জন করা একটি ফরজ কাজ এবং এর চেয়ে বড় ফরজ হল পর্দা রক্ষা করা। পুরুষের মত নারীরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে, শিক্ষকতা করবে এবং শিক্ষার প্রসার করবে এ সম্পর্কিত নির্দেশ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- ‘হে নবী পরিবার! তোমাদের গৃহে যে আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয়

এবং হিকমত পরিবেশন করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর এবং প্রচার কর' (সূরা আহযাব: আয়াত-৩৪)

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, যা কোরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার—পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা—তাহরীম,আয়াত—৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন— 'বান্দা নিজেকে এবং সাথে সাথে পরিবার—পরিজন' (তথা—মা—বোন, স্ত্রী—সন্তানদের)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাগিদ দিযেছেন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত—বন্দেগী করতে হবে, আর আল্লাহর বন্দেগী করতে হলে অবশ্যই বান্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম ।

এমনিভাবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, হাদিসে আছে—

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

অর্থ: একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা (রা.)এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি—পাচড়ার চিকিৎসা পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ—৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে রাসূল (স.)এর উক্তি 'কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না?' থেকেই ইসলামে নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়টি প্রতিয়মান হয়।

৩.১- ইসলামে নারীর মূল্যায়ন

পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক একটা সম্পদ। আর এ সম্পদের মধ্য হতে সেরা সম্পদ হলো— নারী। রাসূলে কারিম (সাঃ) ইরশাদ করেন —

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

অর্থাৎ—দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো পূর্ণশিলা নারী।(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং—১৪৬৭)

যে জিনিস যত বেশি মূল্যবান, তা রাখতে হয় ততটা সযত্নে ও সংগোপনে এবং তার ব্যবহারও করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। মূল্যবান সম্পদকে কেউ অবমূল্যায়ন করে

এখানে–সেখানে যেভাবে ফেলে রাখে না, যে কারো সামনে প্রকাশ করে না, যেন–তেনভাবে অবহেলা করে এটাকে ব্যবহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীকেও বেপর্দাভাবে বাইরে বের হওয়া, যথেচ্ছায় এদিক সেদিক যাওয়া, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, যার তার সাথে দেখা–সাক্ষাৎ করা সবগুলোই তার অবমূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ। মূল্যবান সম্পদ যেভাবে সংরক্ষণে অবহেলা হলে অথবা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ঘটে অনিষ্টতা, ঠিক তেমনিভাবে নারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মূল্যবান জিনিসের মতো অতি মূল্যবান নারীকেও থাকতে হবে তার নির্দিষ্ট বলয়ে। হীরা, মুক্তাকে মানুষ কখনো যত্রতত্র ফেলে রাখে না, কোন ব্যক্তি যদি হীরা–মুক্তার মতো মূল্যবান জিনিসকে যত্রতত্র ফেলে রাখে তাকে কেউ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বলে না, বরং সকলের দৃষ্টিতে সে প্রমাণিত হবে নির্বোধ হিসেবে। নারী হীরা–মুক্তার চেয়েও বহুগুণ দামী। সুতরাং স্বাধীনতা, আধুনিকতা বা অধিকারের নামে তাকে যত্রতত্র ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং নারীর জন্য যেভাবে শিক্ষা জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা দানের পরিবেশ ও পদ্ধতিও হতে হবে শরীয়ত সম্মত, নববী মানহাজ অনুযায়ী। শিক্ষার কারিকুলাম হতে হবে এমন যেখানে একজন নারী বাস্তবিক অর্থে'ই পরিণত হবে পৃথিবীর সেরা সম্পদে। তার শিক্ষার ভিত্তি হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক এমন এক মানহাজ, যাতে সে মন থেকেই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারি হবে, তার জবান হবে সংযত, সে হবে শরয়ী পর্দায় অভ্যস্ত, স্বামীর অনুগত, হবে সন্তান লালন–পালনে আন্তরিক, রান্না–বান্নাসহ ঘরোয়া কাজকর্মে সুদক্ষ এবং সন্তান প্রতিপালনসহ তার এবাদত বন্দেগিগুলোর শরযী বিধান সম্পর্কে সে হবে পূর্ণ জ্ঞাত।

৩.২ আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভুমিকা

একটি সন্তান মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের যে সুশিক্ষা পেয়ে থাকে সেটাই তার জীবনে আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মূল ভিত্তি হয়ে থাকে। আর একজন মা তার সন্তানকে তখন'ই প্রাথমিক পর্যায়ের সুশিক্ষা ও আদব–কায়দা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় যখন দ্বীন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানগুলো যথা– সন্তান লালন–পালন, নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানগুলো তার জানা থাকে। একজন নারী দ্বীনের আহকামগুলো না জানার কারণে নিজে যেভাবে দুনিয়া–আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তেমনিভাবে তার অভিভাবক ও অধীনস্তরাও তার কারনে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও আখেরাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে একজন আদর্শ নারীর কারণে যেমনিভাবে তার অভিভাবকরা হয় দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত, তেমনিভাবে তার অধীনস্থরাও হয়ে থাকে উন্নত আদর্শে আদর্শিত।

কেননা একটি আদর্শ জাতি গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ মানুষের বিকল্প নেই, আর আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই। আল্লামা নুরুল ইসলাম আদীব সাহেব(দা.বা.) এক বয়ানে বলেন— একটি সন্তানের দৈহিক গঠনের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় তার মায়ের দেহের নির্যাস মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা। বাবার ওরশ থেকে যখন সন্তান মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়, সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মায়ের দেহের রক্তের মাধ্যমে সন্তানের দেহ গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনিভাবে সন্তান পৃথিবীতে আসার পর অন্ততপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত যে দুধ পান করে থাকে সেটাও মায়ের দেহ নিঃসৃত। তথা এই সন্তানের দেহের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় মায়ের শরীরের অংশ দ্বারা। সুতরাং বাচ্চার দেহ গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু মায়ের দেহ মিশ্রিত পদার্থের প্রভাব বেশি। তাই মায়ের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি বাচ্চার উপর স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি'ই প্রভাব বিস্তার করবে। আর এটাই স্বাভাবিক।

৩.৩- দ্বীনি শিক্ষা না করার ক্ষতি

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ অভিভাবকই শংকিত তার সন্তানকে নিয়ে। কেননা সুশিক্ষার অভাবে আজ ছেলে বাবার কথা শুনছে না, মেয়ে মায়ের কথা মানছে না। পশ্চিমা ভাবধারায় চলতে গিয়ে তারা আজ নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে শৃংখলহীন এমন এক জীবনের দিকে, যেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, মানুষের বংশপরিচয় বিলুপ্তির পথে, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলছে, যিনা—ব্যভিচারের ফলে ব্যাপক হারে বাড়ছে নতুন নতুন রোগ—ব্যাধি, লজ্জা—শরমের মতো চারিত্রিক মহাসম্পদ সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে।অবশেষে বয়স বাড়ার পর মহিলাদের জীবন নিজের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিমা সভ্যতা, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং সুখী মানুষ বলে মনে করি, যেখানে যেতে পারা, বসবাস করতে পারা অথবা সেখানে যেতে না পারলেও অন্ততপক্ষে নিজের দেশে থেকে তাদের সাংস্কৃতি অনুযায়ী চলতে পারাকে আমরা অনেকেই নিজেদের জাগতিক সফলতার চাবিকাঠি মনে করে থাকি। অথচ তাদের জীবনের সচরাচর বাস্তব অবস্থা হলো এমন, যা আমি সংক্ষিপ্তাকারে উপরে উল্লেখ করেছি।
অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া লোকগুলোর জীবন আচার, চলাফেরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার ফলে একটা গরীব থেকে গরিব লোকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণ ভরে, কোরআন—হাদিসের পড়শে তার জাগতিক জীবনে সে অনুভব করে এক অনাবিল প্রশান্তি। আর এটা, যে যতটুকু কোরআন—হাদিস অনুযায়ী

চলে, যে দ্বীনের ছায়াতলে যতটুকু আশ্রয় নেয় এবং যে যতটুকু কোরআন–হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে ততটুকু অনুভব করতে পারে।

সুতরাং একটা পরিবারকে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য, সেই পরিবারকে ইসলামিক পরিবার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নারীর কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে কোন নারী যদি নৈতিকতাহীনভাবে সমাজে চলাফেরা করে, তাহলে তার একজনের ক্ষতি আরও দশটা নীতিহীন পুরুষের ক্ষতির চেয়েও অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ফিতনামুক্ত দ্বীনি পরিবেশের সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই ।কেননা যে পথে বিপর্যয় আসে সে পথেই তা রোধ করতে হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সেদিকে আমরা তেমন একটা মনোযোগ দেইনি। ইসলামের শুরু যুগে শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে নারীসমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, সাহিত্য ও ইসলামের প্রচার–প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত তারা। অথচ বর্তমানে আমাদের মানসিকতা এমন হয়েছে যে, কেবল রান্না–বান্না করা, স্বামীর খেদমত করা ও সন্তানের লালন–পালন করা, অনেকে আবার আধুনিকতা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে অফিস–আদালত, রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পাড়াকে'ই মহিলাদের কাজ মনে করে থাকে।

অবশ্য মহিলারা যদি উপরোক্ত কাজসমূহ শরয়ী বিধান অনুসারে করে থাকে, তাহলে অবস্থাভেদে এগুলোও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু শরয়ী বিধান অনুসারে কোন কাজ করতে হলে তো তাকে আগে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অথচ সেদিকে আমাদের কোন গুরুত্ব'ই নেই।
আল্লাহর প্রিয় রাসূল (স) তিনি সাবধান করে বলেছিলেন, 'মূর্খতা অপেক্ষা বড় দরিদ্রতা আর নেই।' 'জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম।'
১৪০০ বছর আগে আরবের মাটিতে উম্মিনবী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। পবিত্র কোরআনে বারবার মানুষকে পড়াশোনা করতে, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও জ্ঞান শিক্ষার যোগ্যতা এককভাবে পুরুষদের দেয়া হয়নি।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষায় মুসলিম নারীদের উদ্বুদ্ধ করা ও এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া আজ সময়ের আহ্বান বলা যায়।

ইহকাল ও পরকালের সুপথ রচনা করার জন্য সুশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবজাতির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে ইসলাম। ১৪০০ বছর আগে প্রচার করা মহানবীর মহান বাণীগুলো আজো সমভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বৈপ্লবিক উপদেশ, 'রোগীর সেবার জন্য এক মাইল যাও, দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দুই মাইল যাও, তোমার এক বিশ্বাসী ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য তিন মাইল যাও এবং জ্ঞানের একটি কথা শেখার জন্য ছয় মাইল যাও।' আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনের তওফিক দান করুন। আমিন।

৩.৪সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম :

সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন, العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[ফাজলুল ইলম ওয়াল ওলামা১৫৬ পৃ:, ইবনে আশাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[ফাজলুুল ইলম ওয়াল ওলামা পৃ ৯-১২৮ তিনি প্রায় চল্লিশ টি দিক উল্লেখ্য করেছেন] যেমন- **ক.** ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ। **খ.** নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। **গ.** সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। **ঘ.** নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। **ঙ.** সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। **চ.** সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। **ছ.** সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। **জ.** সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। **ঝ.** নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। **ঞ.** সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

পরিচ্ছেদ -৪:- নারীশিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :-

যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, দেখবেন, ইসলাম নারীদের প্রতি বিশেষ কোমলতা আর মমতা দেখিয়েছে। কেন? এর কারণ দুটো—

প্রথমত, শারীরিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় একটু দুর্বল আর নরম। এটা আল্লাহ তাআলা তাদের এমন করেই বানিয়েছেন। এতে দোষের কিছু নেই। বরং এই কোমলতা দিয়েই তারা সন্তানকে আগলে রাখে, সংসার গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, নারীদের মন খুব কোমল। তারা সহজেই কেঁদে ফেলে, ভালোবাসে, মায়া-মমতা দেয়। এই আবেগ ও কোমলতাই নারীদের আসল সৌন্দর্য। এটা কোনো ত্রুটি নয়। বরং এটাই নারীর বড় গুণ।

শারীরিক ও মানসিক কাঠামোর এই স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব-বণ্টনেও ভারসাম্য রেখেছেন। পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন তার শক্তি-সাহস অনুযায়ী দায়িত্ব। আর নারীর উপর দিয়েছেন তার কোমলতা ও সক্ষমতার উপযোগী দায়িত্ব।

এই ভারসাম্যই আল্লাহর বানানো পৃথিবীর সৌন্দর্য। ঠিক তেমনি

জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্নার মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।'' এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।'' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

৪.১-নারীশিক্ষায় পশ্চিমা ধারনা ও ইসলামিক ধারণার পার্থক্য -

নারীশিক্ষার পশ্চিমা ধারণা ও ইসলামি ধারণার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, পশ্চিমা ধারণায় লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে নারীশিক্ষাকে একটি অধিকার হিসেবে দেখা হয় এবং এতে পেশাগত স্বাধীনতা ও কর্মক্ষেত্রের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ইসলামি ধারণায় নারীশিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে এই শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ এবং পরকালের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পশ্চিমা ধারণা

- **সাম্য ও অধিকার:** পশ্চিমা ধারণায় নারীশিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার যা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

- **পেশাগত স্বাধীনতা:** এটি নারীদের পেশাগত স্বাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের উপর জোর দেয়।
- **সমতা:** লিঙ্গ সমতার উপর ভিত্তি করে বৈষম্য দূর করা এবং নারীদের ক্ষমতায়ন করা এই ধারণার মূল লক্ষ্য।

ইসলামি ধারণা

- **ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব:** ইসলামে নারীশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।
- **ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ:** এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উন্নত করা এবং পরিবার ও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম করা।
- **জ্ঞানার্জনের সমান অধিকার:** ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান অর্জনের সমান অধিকার রয়েছে, যা কুরআনেও বর্ণিত আছে।
- **পরকালের জন্য প্রস্তুতি:** ইসলামি ধারণায় পার্থিব শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষারও গুরুত্ব রয়েছে, যা পরকালের জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।
- **শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** ইসলামি নারীবাদ নারীর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়, যা তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

কিন্তু তারা বুঝে না—এই কথাগুলোর পেছনে কী ভয়ংকর ফাঁদ লুকিয়ে আছে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি, বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর

অশ্লীলতাকে বলে ‘প্রগতিশীলতা’। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এসব প্রপাগান্ডা চালায়, তারা প্রথমেই বলে—ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার ভেতরে বন্দি করে রেখেছে। আর তার বিপরীতে তারা দেখায়—অমুসলিম সমাজে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করে!

অথচ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ। পর্দা মানে বন্দিত্ব নয়; বরং নিরাপত্তা। পর্দা মানে মর্যাদা রক্ষা, নিজেকে সম্মানের ঢালে ঘেরা।

নারী যখন পর্দায় থাকে, সে নিজেও নিরাপদ থাকে। তাকে কেউ ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, ব্যবহার করতে চায় না। পুরুষ সমাজও তখন সংযত থাকে—চোখ, মন ও প্রবৃত্তি থাকে নিয়ন্ত্রণে।

আসুন, একবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই— যেখানে নারীদের ‘স্বাধীনতা’র নামে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে নামানো হয়েছে পণ্যের মতো। পর্দাহীনতার এই পথ তাদের কোথায় নিয়ে গেছে?

বিবাহের প্রতি ঘৃণা, পরিবার ভাঙনের মহামারী, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, লিভ-ইন সম্পর্ক, আত্মহত্যা আর বিষণ্নতার ঢেউ—এটাই সেই স্বাধীনতার পরিণতি, যা তারা দিয়েছে পর্দাহীনতার নামে।

ইসলাম আমাদের যে একটি বড় নেয়ামত দিয়েছে, তা হলো—পর্দা ব্যবস্থার নির্দেশনা। যার সুফল আমরা নিজেরাই প্রতিদিন ভোগ করছি, অথচ অনেকেই তা বুঝে উঠতে পারি না।

আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম নারী আজ একটা মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার। তারা ভাবে, ইউরোপ-আমেরিকার নারীরা পর্দাহীন, তাই নাকি তারা স্বাধীন। আমাদের নারী সমাজ পর্দায় আবদ্ধ, তাই আমরা পিছিয়ে আছি।

অথচ এ ভাবনা একেবারে ভুল। কারণ প্রকৃত বিষয় মোটেও এমন নয়। বাস্তবতা হল, তথাকথিত স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে অন্তহীন শ্রম ও উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তাদের দেখা হয় ‘ও কাজ পারে কিনা’, ‘ও ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা’, আর সুযোগ পেলে অনেক সময় হয়—উপভোগের এক বস্তু।তুমি নিজেই ভাবো—এটা কি নারীর প্রকৃত সম্মান? এসব মেয়েরা সম্মান লাভ করেছে নাকি লাঞ্ছিত হচ্ছে?

আমাদের সমাজে এখনো কিছুটা হলেও ইসলামের পর্দা, শালীনতা, সম্পর্কের পবিত্রতা টিকে আছে। নারী এখনো অনেকাংশে নিজেকে সম্মানিত মনে করে, পুরুষ এখনো অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। সন্তানরা এখনো মা-বাবার ছায়ায় বড় হয়, একটি পূর্ণ পরিবারে হাসি-আনন্দে বেড়ে ওঠে।

এটাই সেই কল্যাণ, যা ইসলামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সামাজিক ভূমিকা পশ্চিমা ধারণার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পার্থক্য শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব জীবনের সীমা ও শর্তাবলিতেও তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেগুলো ইসলামী শরিয়ত দ্বারা নির্ধারিত।

আমাদের উচিত নয় যে নারীদের শিক্ষার বিষয়টি আমরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির চশমা দিয়ে বিচার করি।

এমন ভাবা ঠিক নয় যে পশ্চিম থেকে আসা প্রতিটি বিষয়কেই যাচাই-বাছাই ছাড়াই তার সব নেতিবাচক দিকসহ গ্রহণ করতে হবে; সে যতই আমাদের জন্য উপকারী হোক কিংবা ক্ষতিকর।

আমাদের প্রথম দায়িত্ব এই যে আমরা নারীশিক্ষার বিষয়টিকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে বিবেচনা করব, যেখানে পুরুষ ও নারীর অধিকার, কর্তব্য এবং সামাজিক ভূমিকায় পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আছে।

এটা ঠিক যে কিছু মানুষ নারীশিক্ষার ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করছেন, তা নিয়ে আমাদের অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আমি নিজেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁদের এই বিধি-নিষেধ আরোপ করার পেছনে মূলত যে আশঙ্কা কাজ করছে তাহলো এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের সমাজে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কন্যারা এমন এক পথে চালিত হয়ে পড়তে পারে, যা আমাদের ধর্ম ও মূল্যবোধের পরিপন্থী।এ

জন্যই যখন আমরা নারীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলি, তখন আমাদের অবশ্যই ইসলামী বিধান ও নির্দেশনাগুলোকেও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে, বিশেষত নারীর সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে। এর মধ্যে হিজাবের বিষয়টিও রয়েছে, যেটিকে কিছু পশ্চিমা দেশে এমন অপরাধ হিসেবে দেখা হয়, যেন এটি কোনো কলঙ্ক বা লজ্জাজনক চিহ্ন।

আমাদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে ইসলাম শুধু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকেই উৎসাহ দেয় না, বরং বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞান অর্জনেও মুসলিম নারীদের উৎসাহিত করে। তবে শর্ত এই যে নারীরা যেন প্রতিটি ধাপে ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ করে।

পরিচ্ছেদ ৫: –যুগে যুগে নারীশিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ -

যুগে যুগে নারীশিক্ষার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, প্রাচীনকালে বৈদিক ও ইসলামি যুগে নারীর শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা হ্রাস পায়। মধ্যযুগে নারীশিক্ষা প্রায় অবহেলিত ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে এটি আবার গুরুত্ব লাভ করেছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রাচীন যুগ

- **বৈদিক যুগ:** এই যুগে নারীরা শিক্ষা লাভে পারদর্শী ছিলেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য রচনায় তাঁদের অবদান দেখা যায়।
- **ইসলামি যুগে:** ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ধনী পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করত এবং মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়েও মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করত।

মধ্যযুগ

- এই যুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীশিক্ষা গুরুত্ব হারায় এবং নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হতো।
- শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে এবং নারীশিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখা যায়।

আধুনিক যুগ

- আধুনিক যুগে নারীশিক্ষার গুরুত্ব পুনরুজ্জীবিত হয়। নারী শিক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।
- নারী শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- বর্তমানে নারীশিক্ষার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫.১ -মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নারীশিক্ষা -

মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসের কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন, তা ভাস্বর হয়ে থাকবে মহাকাল। তিনি নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছেন, তা অতীত ও বর্তমানের কোনো ব্যক্তি, আইন, জীবনপদ্ধতি দান করতে পারেনি।

জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে নারী-পুরুষের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা

সুরা বাকারার দুই আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন, যা আমাকে আরশের নিচের ভাণ্ডার থেকে প্রদান করা হয়েছে।অতএব, এগুলো তোমরা নিজেরা শেখো ও তোমাদের নারীদের শেখাও।' (দারেমি, হাদিস : ৩৪৩০)

আনসারি নারীরা দ্বিনের গভীর জ্ঞানার্জনে অনেক আগ্রহ রাখতেন, তাই আয়েশা (রা.) তাদের প্রশংসা করে বলেন, 'আনসারি নারীরা কত ভালো! দ্বিনি জ্ঞানার্জনে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।' (মুসলিম, হাদিস : ৩৩২)

মূলত ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নর-নারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেনি; বরং এটি সবার জন্যই অবধারিত করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর মর্যাদা ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিকল্পে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে এমন সব পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যাতে তা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।কন্যাদের প্রতি পুত্রদের সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারো যদি একজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো ধরনের অবহেলা করেনি এবং পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর কোনো ধরনের প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৪৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নারীর মাতা-পিতাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে তিনটি কন্যাসন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদের শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করল, অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত অবধারিত করে দেবেন।তখন জনৈক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, দুটি কন্যা প্রতিপালন করলেও? তিনি জবাবে বলেন, দুটি করলেও।' (মিশকাত, হাদিস : ৪৯৭৫)

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (অর্থাৎ উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।' (বুখারি : ৩৩৩১)।

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম নারীদের অন্তরে জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ইবনে সাদ তাঁর 'তাবাকাতে' ৭০০ নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বা তাঁর সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর 'আল-ইসাবাহ ফি তামায়িজিল হাদিস' নামক গ্রন্থে এক হাজার ৫৪৩ জন নারী হাদিসবিশারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও

বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) ছিলেন নারী শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহুসংখ্যক সাহাবি ও তাবেঈন তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন অনেক নারী চিকিৎসাসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধে আহতদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধেও গমন করেছিলেন। নুসাইবা বিনতে কাব আল-আনসারী (রা.) ছিলেন মদীনার একজন প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক। উম্মে আম্মারা নামে বেশি খ্যাত এই নারী সাহাবি।

রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামিয়া (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন মদিনার অন্য একজন নারী চিকিৎসক। তাঁকে 'ইসলামের প্রথম নার্স' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূলত তাঁর চিকিৎসক পিতা সাদ আল-আসলামির নিকট থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে আহত সব সৈনিককে তার কাছে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতেন।

শিফা বিনতে হারেস ইসলামে সর্বপ্রথম পারিবারিক শিক্ষিকা ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান ও উম্মে শারিক ইসলামের প্রসিদ্ধ দাঈ ছিলেন। নারী তাবেঈনদের মধ্যে হাফসা বিনতে সিরিন ইবাদত, ফিকহ ও কোরআন-হাদিসের সুগভীর জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একজন নারী শিক্ষিকা নাফিসা বিনতুল হাসানের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে হাদিস শুনতেন। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) ৮০ জনের বেশি নারীর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ রকম মহীয়সী নারীদের নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা অধ্যয়নে আমাদের উজ্জ্বল অতীত অনুভূত হয়।

মধ্যযুগেও মুসলিম নারীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সুতাইতা আল-মাহামালি নামের এক নারী গণিতবিদ বাগদাদের এক বিদ্যোৎসাহী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাগদাদের একজন বিচারপতি ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এভাবেই বহু মুসলিম নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। নারী শিক্ষা উন্নয়নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাবনা ও অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

‘‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।’’[ইবনে আব্দি রাব্বিহি - আল ইকদুল ফরিদ]

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في موخر النساء.

‘‘জুম‘আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।’’[ইবনে সাদ - আত তাকাবাত ৮ম খন্ড]

হারিসা ইবনু নু‘মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

«ما حفظت "ق" إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم»

‘‘আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম‘আর খুতবাতে এটি পড়তেন।’’[মুসলিম,সহিহ মুসলিম]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

«فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة»

‘‘তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।’’[বুখারি]

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

‘‘মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।''[বুখারি] মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ''তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।''[বুখারী]

৫.২-সাহাবীদের যুগে নারীশিক্ষা :-

মহানবি (স) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার বুনিয়াদ খুলাফায়ে রাশিদার আমলে ব্যাপক ও বিস্তৃত রুপ লাভ করে। প্রথম যুগের তুলনায় এ যুগে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা শুরু হয়,যদিও তা ছিল মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষার অর্ন্তগত।এ সময়ে তাফসিরুল কুরআন, হাদিস,ফিক শাস্ত্র ও প্রাক- ইসলামি কবিতা পাঠ স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষার ইতিহাসে আরেকটি দিক ছিল, বন্দী ও জিম্মি শিক্ষিত লোকদের মুসলমান অশিক্ষিত দের শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হতো। হয়রত ওমর (র) এর খিলাফত কালে ইসলামি শিক্ষার উপর পাঠদান করার জন্য তিনি দামেস্ক,বসরা, কুফা প্রভূতি বিখ্যাত শহরে বিদ্বান শিক্ষকদের প্রেরন করেন। সপ্তদশ হিজরিতে কুরআন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরন করেন। প্রতি শুক্রবার এদের বক্তব্য শোনার জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদের অধিবাসী দের প্রতি খলিফার কড়া নির্দেশ থাকত। মসজিদ ভিত্তিক এসব শিক্ষায়তনে জমায়েত হতো বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী।শুধু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর অধীনে ছিল ৪ হাজার শিক্ষার্থী।সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োজিত থাকতেন। অভিভাবকদের উপর খলওফার নির্দেশ ছিল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খলিফা হযরত আমি (রা) নিজেই একজন অসাধারণ পন্ডিত ও বিগঞানী ছিলেন। হযরত আলী রা: নিজেই দর্শন,ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র,ব্যাকরণ,হাদিস, কাব্য ইত্যাদির উপর সাপ্তাহিক মজলিসএ বক্তৃতা দিতেন। খুলাফায়ে রাশিদার আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক।

সাহাবিদের যুগে নারীশিক্ষা বিদ্যমান ছিল, যেখানে নারীরা ঘরে ও সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করতেন এবং রাসুল (সা.)-এর মজলিস থেকেও উপকৃত হতেন, যদিও তাদের শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। এই যুগে উম্মে সুলাইম এবং উম্মে আতিয়্যার মতো অনেক জ্ঞানী মহিলা সাহাবী ছিলেন, যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন এবং জ্ঞান বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ক. সাহাবিদের যুগে নারীশিক্ষার পদ্ধতি ও গুরুত্ব

- **ঘরে ঘরে শিক্ষা:** সাহাবিরা নিজেদের পরিবারে নারীদের এবং শিশুদের কোরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন।
- **রাসুল (সা.)-এর মজলিস থেকে শিক্ষা:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁর আলোচনা থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন, যদিও তারা পুরুষের সঙ্গে একই মজলিসে বসতেন না।
- **জ্ঞান অর্জন ও প্রচার:** উম্মে সুলাইম (রা.)-এর মতো অনেক সাহাবী নারী জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং ইসলাম প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
- **আইনশাস্ত্রে পারদর্শিতা:** কিছু নারী সাহাবী, যেমন উম্মে সালামা (রা.), আইনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং তাদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা অনেক হাদিস থেকে প্রমাণিত।
- **ইসলামী জ্ঞান ও তার প্রয়োগ:** নারীরা শুধু দ্বীনি ইলমই অর্জন করতেন না, বরং ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে অবদান রাখতেন।

খ. কিছু উল্লেখযোগ্য নারী সাহাবী

-**উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) :** উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দুহিতা। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর।
হাদিসে তাঁর অনেক মানাকিব বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২৬)
উরওয়া বিন জুবায়ের (রা.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও কবিতায় বেশি জ্ঞানসম্পন্ন অন্য কাউকে আমি দেখিনি। (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৮৩)
মাসরুক (রহ.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর বড় সাহাবিদের আয়েশা (রা.)-কে উত্তরাধিকার (মিরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। (তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

- **সুমাইয়া (রা.):** ইসলামের প্রথম শহীদ নারী এবং ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।
- **উম্মে উমারা নুসায়বা বিনতে কাব (রা.):** প্রথম 'বায়াত' (শপথ)-এর সময় তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দুই নারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

- **উম্মে সুলাইম (রা.):** তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন এবং অনেক হাদিসে তার মর্যাদা ও অবদানের কথা উল্লেখ আছে।
- উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা.)-এর নাম হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (রা.)। জাহাবি (রহ.) তাঁকে ফকিহ বলেছেন এবং তাঁর আইনশাস্ত্রে দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বহু হাদিস থেকে প্রমাণিত।উদাহরণস্বরূপ, হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তির সময়ে মহানবী (সা.) যখন সাহাবায়ে কেরামকে ওমরাহ না করে 'হলক' (মাথা মুণ্ডান)-এর নির্দেশ দেন, সে সময় সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিকভাবে তা অনুসরণ না করে ওমরাহ করার সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। উম্মে সালামা (রা.) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজের চুল নিজেই কাটতে পরামর্শ দিলেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রাসুল (সা.)-কে চুল কাটতে দেখে তাঁরাও একে অপরের চুল কাটতে লাগলেন। এভাবেই উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শে সাহাবায়ে কেরাম সংঘাত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন। আর তাঁর আইনশাস্ত্রে দূরদর্শিতার এমন উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। (আল-আলাম : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯৭).

গ. ইসলাম প্রচারে নারী সাহাবীদের ভুমিকা -

ইসলাম প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এর মাধ্যমে অনেক মানুষ হেদায়াত পায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলাম প্রচার করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারি, হাদিস : ৩২১৫)

যুগে যুগে ইসলাম প্রচারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন ঘরের ভেতরে আলোকবর্তিকা আর প্রয়োজনে মাঠের বীরাঙ্গনা। ইসলাম প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় তাঁদের অবদান ও আত্মত্যাগ কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।রাসুলুল্ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে তাঁর নিকটাত্মীয় এবং পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁদের মধ্যে খাদিজা (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তিনি প্রথম নামাজ আদায় করেন। তিনি প্রথম কিবলার অনুসারী ছিলেন।সুতরাং তিনি ছিলেন একাধারে প্রিয়তমা স্ত্রী, সমর্থক এবং সহযোগী ইসলাম প্রচারক।

নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো বায়াত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার। ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও দায়িত্ব, কর্তব্য ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে। এর প্রমাণ মেলে ইসলামের সূচনালগ্নেই নারীদের বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম বায়াত নবুওয়াতের দশম বছরে হজের মৌসুমে সংঘটিত হয়। তখন মদিনার ছয়জন

ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এটাই ছিল আকাবার প্রথম শপথ। নবুওয়াতের ১৩তম বছর মদিনার ৭৫ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং দুজন নারী ছিলেন। এটাই ছিল ইতিহাসে নারীদের প্রথম বায়াত গ্রহণের ঘটনা। নারী দুজনের একজন ছিলেন উম্মে উমারা নুসায়বা বিনতে কাব। দ্বিতীয় জন ছিলেন উম্মে মানী আসমা বিনতে আমর। (ইবনে হিশাম : ১/৪৪০-৪৪১)

যুগে যুগে যাঁরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন সুমাইয়া (রা.)। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি ইয়াসির (রা.)-এর স্ত্রী ও আম্মার (রা.)-এর জননী। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের ওপর কঠোর জুলুম নির্যাতন করত। যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির (রা.) এবং তাঁর মা সুমাইয়া (রা.)-কে বিপদগ্রস্ত দেখতেন, তখন বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার, সবর কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা করো। আবার কখনো বলতেন, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। তাঁদের হৃদয়ে ঈমানের অটল দৃঢ়তা এতটাই ছিল যে, কোনোভাবেই তাঁদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো যায়নি। জুলুম-নির্যাতনের এক পর্যায়ে আবু জাহেল বর্শা দিয়ে সুমাইয়া (রা.)-কে আঘাত করে নির্মমভাবে শহীদ করে। এই মহান নারীর রক্তে সিক্ত হয় ইসলামের প্রথম শহীদির ইতিহাস। (সিরাতুল মুস্তফা : পৃ. ১৯৯)

সুমাইয়া (রা.) প্রমাণ করেছেন, একজন নারীর ঈমান ও ত্যাগ কতটা দৃঢ় হতে পারে। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ পরবর্তী প্রজন্মের মুমিন নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে আছে।

আসমা (রা.)-এর জীবন থেকে অন্য মুমিন নারীদের জন্য রয়েছে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা।হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সে সন্ধির পেছনেও ছিল নারী সাহাবি ও রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.)-এর অপরিসীম ভূমিকা। যখন কেউ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না, তখন তিনিই নবি (সা.)কে বসে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান বিস্তারে হজরত আয়েশা (রা.) অতুলনীয়। ইলমি জ্ঞানে অনেক পুরুষ সাহাবি থেকেও তিনি বেশি পণ্ডিত ছিলেন।

শুধু জ্ঞান আর উৎসাহ দিয়েই নারী সাহাবিরা ক্ষান্ত হননি। নারী সাহাবি হজরত নুসাইবা (রা.) অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। আর হজরত রুফাইদা (রা.) আহত সাহাবিদের দিনরাত সেবা দিয়েছেন। যুদ্ধে গিয়ে কেউ আহত হলেই নবি (সা.) তাকে নারী সাহাবি রুফাইদা (রা.)-এর কাছে নিয়ে যেতে বলতেন।

বিভিন্ন সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হজরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা.) ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবি (সা.)-এর ফুফু সুফিয়া বিনতে আবদিল মুত্তালিব (রা.) খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মুল খায়ের, জুরকা বিনতে আদি, ইকরামা বিনতে আতরাশ ও উম্মে সিনান অসংখ্য যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কাজে সহযোগিতা করেন। আজরা বিনতে হারিস বিন কালদা সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান ও আহলে বিসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

উম্মে আম্মারা (রা.) ওহুদের যুদ্ধে মহানবি (সা.)-এর জীবন রক্ষায় প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করেছিলেন। মহানবি (সা.) তাকে 'খাতুনে ওহুদ' উপাধি দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম শাহাদতবরণ করেন উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)। উম্মে আতিয়া আনসারি (রা.) মহানবি (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উমাইয়া বিনতে কায়েস কিফারিয়া খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মে হাকিম বিনতে হারিস রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম নারীরা শুধু দ্বীনি ইলম-আমলেই নয়; ইসলাম প্রচার-প্রসারেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। ইসলামি আন্দোলনের নানা দিক ও বিভাগে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মুসলিম নারীদের ঐতিহ্য।

৫.৩-তাবেয়ীদের যুগে নারীশিক্ষা :-

মক্কা, মদীনা, কুফার ন্যায় বসরা নগরীও ছিল দ্বীনের এক উর্বর ভূমি। এ উর্বর ভূমিতে জন্ম নিয়েছেন হাজারো আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ক্বারী, আরবী ব্যাকরণবিদ, আবেদ, যাহেদ। হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, রাবেয়া বসরী, মুয়াযা আল আদাবিয়া, ছিলা ইবনে আশইয়াম, ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া এ মহামনীষীগণ এ বসরা নগরীরই সন্তান। হাফসা বিনতে সীরীনও তাদের একজন। নারী তাবেয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির।তিনি ইলম, প্রজ্ঞা, ইবাদাত-বন্দেগী, পরহেযগারী ইত্যাদিতে হাসান বসরী ও আপন ভাই মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সমকক্ষ। নবীজীর একান্ত খাদেম হযরত আনাস রা.-এর সাথে ছিল তার পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর কাছ থেকে হাফসা বিনতে সিরীনের ভাই-বোন সকলে ইলম, আমল, আখলাক শেখেন।

নুসায়বা বিনতে কা'ব নামে একজন বড় সাহাবিয়া ছিলেন।যার কথা এর পুর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।তিনি নবীজীর সাথে অনেক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অসুস্থদের সেবা করতেন। আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবীজীর কন্যা ইন্তেকাল করলে তাঁকে তিনিই গোসল করান। মৃতের গোসলের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর হাদীসই মূল। ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন-

كانت من كبار نساء الصحابة
তিনি নারী সাহাবীগণের মধ্যে উপরের তবকার সাহাবিয়া ছিলেন।

হাফসা বিনতে সীরীন এ মহান সাহাবিয়া থেকেও ইলম শেখেন এবং তাঁর আমল, আখলাক ও প্রজ্ঞা দ্বারা আলোকিত হন।

বসরাতে ছিলেন আরেক মহান তাবেয়ী আবুল আলিয়া রুফাই ইবনে মেহরান। তাবেয়ীদের মাঝে ইলম, আমল ও প্রজ্ঞায় যারা শীর্ষে, তিনি ছিলেন তাদের একজন। আবু বকর ইবনে আবু দাউদ বলেন, সাহাবীদের পর কুরআন সম্পর্কে আবুল আলিয়া থেকে বেশি জ্ঞানী কেউ নেই। হাফসা বিনতে সীরীন এ মহান তাবেয়ী থেকেও ইলম অর্জন করেন।সম্ভবত হাদীসের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে তার হাদীস নেই। হাদীসশাস্ত্রে যেসব ব্যক্তি শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত, যাদের হাদীস গর্ব সহকারে হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করতেন হযরত হাফসা এদের অন্যতম।

হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি যেমন বিদগ্ধ প-িত ছিলেন তেমনিভাবে জ্ঞানী ছিলেন কুরআনের বিষয়েও। কুরআন পাঠের অনেক নিয়মনীতি আছে। মদ-গুন্নাহ, মাখরাজ, সিফাত, ওয়াকফ-ওয়াস্ল-সহ অনেক বিষয় রয়েছে, যার কায়দা-কানুন অনেক। আবার কুরআনের অসংখ্য শব্দ এমনও রয়েছে, যা বিভিন্নভাবে পড়া যায়, যাকে পরিভাষায় ‘কিরাত’ বলে। এটা স্বতন্ত্র এক বিরাট শাস্ত্র। হযরত হাফসা এ শাস্ত্রেও পা-িত্য অর্জন করেন; বরং মাত্র বার বছর বয়সেই এ শাস্ত্র আয়ত্ব করেন। হাফসা বিনতে সীরীন হলেন মহান তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-এর বোন। ইবনে সীরীন ইবাদাত-বন্দেগীসহ যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে হাসান বসরীর সমকক্ষ; বরং কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে তিনি এগিয়ে। দু’জন একই সময়ের এবং একে অপরের বন্ধু। এ ইবনে সীরীনের মত মহাপ-িতও কুরআনের কোনো কোনো বিষয়ে বোন হাফসার শরণাপন্ন হতেন। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআনের পাঠরীতির কোনো বিষয়ে ইবনে সীরীনের খটকা হলে বলতেন, যাও তোমরা হাফসাকে জিজ্ঞেস কর। আর সে কীভাবে পাঠ করে শোন।মোটকথা, ইলম, ইবাদত, আখলাকসহ সব গুণে তিনি ছিলেন অনন্য। এসব গুণাবলীতে তিনি অনেক পুরুষকে ছাড়িয়ে যান। হাসান বসরী তো সবার নিকট প্রসিদ্ধ, তেমনি হাফসার ভাই ইবনে সীরীনও তাবেয়ীদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ বলেন, হযরত হাফসা এদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

তাছাড়াও আরও অনেক প্রসিদ্ধ নারী তাবেয়ী রয়েছেন যারা বহুকাল ইসলামের সেবায় নিয়োজত ছিলেন। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

“উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।”[ইবনে হাজার আল আসকালানি]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেনঃ
‘‘তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।’’[তাজকিরাত যায়নাব বিনতে আবু সালামা]
আবূ রাফে‘ সায়িগ (র.) বলেনঃ
كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة.
‘‘যখনই আমি ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।’’[ইবনে সাদ,আত তাকাবাত]
আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:
كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة
‘‘উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন ফকীহ্ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।’’[বুখারী]
‘‘তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।’’[ইবনে আব্দিল বার]
‘‘তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।’’[ইমাম নববী]
ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উমর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,
كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.
‘‘তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।
উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন:
وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
‘‘তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।’’[প্রাগুক্ত]

ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন:

ارجع فالغلط معك.

"তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।"[তদেব]

একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া'কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ"আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।"[মুসলিম]

সুতরাং বলা যায় তাবেয়ী যুগে নারীশিক্ষা বেশ উন্নত ছিল, এবং এই সময়ে নারীরা জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। উম্মুদ দুরদা আস-সুঘরা দামেস্কের মসজিদে নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষাদান করতেন, যা এই যুগের নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এছাড়াও, অনেক তাবেয়ী নারীরা হাদীস এবং ইসলামী জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতেন।

তাছাড়া তাদের জীবনী পড়লে দেখা যায় তারা মাশাল্লাহ দ্বীনের কতোটা খেদমতদার ছিলেন। যার গুরুত্ব ছিল এমন যে , তা বর্তমান যুগ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলে আসছে।

- **শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ:** অনেক তাবেয়ী নারীরা হাদীস বর্ণনা এবং ইসলামী জ্ঞান প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন, যা তাদের শিক্ষাগত গুরুত্ব প্রমাণ করে।
- **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** উম্মুদ দুরদা আস-সুঘরা (রহঃ) এর মতো নারীরা দামেস্কের মসজিদে নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষাদান করতেন।
- **ঐতিহ্য ও প্রেরণা:** অনেক তাবেয়ী নারীর জীবন ও জ্ঞানচর্চার ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা এবং ইসলামের শিকড়কে শক্তিশালী করেছে।
- **সামাজিক প্রভাব:** তাবেয়ী যুগে নারীর অংশগ্রহণ শুধু ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা সমাজ সংস্কার এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

৫.৪-উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারীশিক্ষা :-

উমাইয়া যুগে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসুচি এবং শিক্ষাদানের বিষয় এ নতুন পদ্ধতির সূচনা লাভ করে এবং পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদের সাথেই এসব স্কুল সংযুক্ত ছিল। উমাইয়া যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল হালাল - হারামের বিষয়াদি, আরবি ব্যকরণ ইত্যাদি। ইসলামের বিজয় ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে পড়ানো হয়। এছাড়া দেশপ্রেম, সামরিক উৎসাহ মূলক বক্তৃতা, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড়, শিক্ষা সফর,সাঁতার শিক্ষা দেওয়া হত। উমাইয়া যুগের শিক্ষার পদ্ধতি

সম্পর্কে outline of Islamic culture গ্রন্থের লেখক A.M.A Shustery বলেন : অবাধ বক্তব্য ছিল শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনার জন্য শত শত ছাত্র এবং হাজার হাজার শ্রোতা উপস্থিত হতো।ভর্তির ব্যাপারে ছিল না কোন বাধ্যবাধকতা এবং সাধারণভাবেই কোন অর্থ দিতে হতো না। উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুটো রুপ পাওয়া যায়। তার একটি হলো খলিফা বা অভিজাত শ্রেণির সন্তানদের শিক্ষা। অভিজাতরা গৃহশিক্ষক এর মাধ্যমে এবং নির্ধারিত বিষয়ে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এর লক্ষ্য ছিল মর্যাদাবান শাসন- সংক্রান্ত প্রগঞ্জা ও কূটনৈতিক কৌশল, সামরিক নৈপুণ্য শেখার মাধ্যমে শাসক সৃষ্টি করা। উমাইয়া যুগেই শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, অনুবাদ ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে ও আগ্রহ বাড়তে থাকে। খলিফারাও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা - সংস্কৃতির যে পূর্ণ বিকাশ ঘটে তার বীজ উমাইয়া যুগে বপন করা হয়েছিল।

উমাইয়া যুগে নারীশিক্ষা

- **বিশিষ্ট উদাহরণ:** মুসায়েব এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সালেহ জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবের ইতিহাস শাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তাঁকে পুরস্কৃত করেন।
- **সাহিত্য:** সাবিনা বিনতে হুসাইন (আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ানের কন্যা) সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন এবং ফারাযদাকের মতো কবিদেরও তাঁর প্রশংসা করতে হয়েছিল।
- **শিক্ষা পরিবেশ:** মসজিদ ও গৃহ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

উমাইয়া যুগে নারীরা সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করত। "হজরত ইমাম হুসাইনের কন্যা সাঈদা সখিনা, তালহার কন্য আয়েশা, মক্কার খার্কা এবং ওয়ালিদের মহিসী উম্মুল বানীন ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও প্রতিভা সম্পন্ন মহিলা। খলিফা মুয়াবিয়ার কন্যা আতিকা এবং আবদুল মালিকের স্ত্রী আতিকা খলিফাদের উপরে প্রচুর প্রভাব খাটাতেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও নারীগণ পশ্চাদপদ ছিলেন না। এ যুগের তাপসী রাবেয়া সাধ্বী ও সাধিকা রূপে আজও মুসলিম জগতে পরিকীর্তিত হচ্ছেন। এ ছাড়াও ঐ যুগের বহু আরব নারী কবিতা রচনা ও আবৃত্তির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।"

আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা উমাইয়া যুগের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত। আব্বাসীয় খলিফারা রাজ্য শাসন ও রাজ্যজয় অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ইতিহাসে অধিক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এ যুগ ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

আব্বাসীয় যুগেও বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না; যদিও সে সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং অনেক মক্তব-মাদরাসাও গড়ে উঠেছিল। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুটি রূপ ছিল : ১. প্রাথমিক ও ২. উচ্চ পর্যায়ের। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল মসজিদ ও গৃহাঙ্গনে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত বলেন যে তিনি একজন শেখের গৃহকে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। ফলে উমাইয়া যুগের মতো বেশির ভাগ শিশু ও কিশোরের শিক্ষাঙ্গন ছিল গৃহাঙ্গন ও মসজিদ। গৃহে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে পিতার ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান শিক্ষার হাতেখড়ি নিত সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়েবা পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে।

আব্বাসীয় যুগে নারীদের শিক্ষার্জনের প্রসার ও ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। অভিজাত ঘরের মেয়েরা Private tutor রেখে ধর্ম ও শালীনতামণ্ডিত সাহিত্য, ছন্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। উচ্চশিক্ষার আধার ছিল বায়তুল হিকমাহ। খলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে সৌরবিজ্ঞান, অনুবাদ, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিক, সিরীয় ও পারসি সাহিত্যের অনুবাদ, সাহিত্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো।

ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে প্রথম উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে দরসে নিজামি। সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান ও মালিক শাহর আমলে তাঁদের পারসি মন্ত্রী নিজামুল মুলক এ প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হয়।

৫.৫-ঐতিহাসিক উদাহরণ :-

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই, হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা পর্দা-শালীনতা বজায় রেখে জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তার যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা, হজরত আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, মায়মুনাহ, উম্মে সালামাহ এবং সাফিয়া বিনতে হুয়ায় (রা.)-এর কাছে হাদিসের জ্ঞান লাভ করতেন। নবিপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। উম্মুল মোমিনিন হজরত আয়েশা (রা) একাই ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যা সব মুসলিম হাদিস বর্ণনাকরীর মধ্যে ২য় সর্বোচ্চ। এছাড়া ওই সময় অধিকাংশ নারী সাহাবি তাদের মেয়েদের যত ধরনের নারীঘটিত ব্যক্তিগত মাসআলা-মাসায়েল দরকার হতো, তা হজরত আয়েশা (রা.) থেকে শুনতেন, আমল করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন কেমব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। যার খণ্ডের সংখ্যা ৪৩টি। যেখানে নারী

হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন কর্ম-অবদান তুলে ধরা হয় ১০ হাজারেরও বেশি। উম্ম-উদ-দারদা সুগরাহ ছিলেন একজন তাবাইয়া। ৭ম শতাব্দীর দামেস্কের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ। তিনি তৎকালীন ইবনে সিরীন এবং হাসান আল-বাসারীর মতো বিশিষ্ট হাদিস বিশারদদের থেকেও উচ্চতর ছিলেন। এছাড়া তিনি খলিফা আবদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের ফিকাহ শিক্ষক। আবার আবিদা আল-মাদানিয়াহ ছিলেন একজন মুক্তকৃত দাস এবং স্প্যানিশ হাদিস পণ্ডিত হাবিব দুহানের স্ত্রী। ৮ম শতাব্দীতে যিনি ছিলেন বেশ পরিচিত। আবার ফাতিমা আল-বাতায়াহিয়াহ ৮ম শতাব্দীর একজন সুপরিচিত পণ্ডিত ছিলেন এবং যিনি দামেস্কে সহিহ বোখারি পড়াতেন। বিখ্যাত সাহাবির কন্যা আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াকাসও ছিলেন এতই জ্ঞানী যে ইমাম মালিক, হাকিম ইবনে উতায়বা এবং আইয়ুব সাখতিয়ানি ছিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে। এছাড়া দশম ও দ্বাদশ শতকে জয়নাব বিনতে কামাল, ফখর আন-নিসা উম্মে মুহাম্মাদ শুহদাহ আল-বাগদাদিয়াহ (আবু নসর আহমদ ইবনে আল-ফারাজ আল-দিনাওয়ারির (মৃত্যু ৫৭৪ হি কন্যা) হাদিসে বাগ্মী এবং ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শী), উম্মুল কিরাম কারিমা বিনতে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম আল-মারওয়াযিয়াহ (মৃত্যু ৪৬৫ হি.)। হুমায়দাহ বিনতে মুহাম্মদ শরীফ ইবনে শামস আদ-দ্বীন আল-আসবাহানিয়্যাহ (মৃত্যু ১০৮৭), ত্রিয়দশ শতকের দিকে ফাতিমা বিনতে আল-জুজদানিয়াহ (মৃত্যু ৫২৪), দামেস্কের জয়নাব বিনতে উমর আল-কিন্দি, উম্মে সালামাহ আস-সালাফিয়াহ, ইয়েমেনের আয়েশা বিনতে মুকবিল প্রমুখ। তারা হাদিস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে, মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তাছাড়া স্পেনের আয়েশা বিনতে আহমদ ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, লুবনি ছিলেন ভাষাবিদ এবং রাবিয়া কাসিসাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ বক্তা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণেও নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ ছিল। যেমন-আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় যা মরক্কোর ফেজে অবস্থিত। যেটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ইউনেস্কো এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুসারে এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম ও প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। যার প্রতিষ্ঠাতা ফাতিমা আল-ফিহরি বিশ্বনন্দিত একজন মুসলিম নারী, সিত্তুশ শাম ফাতেমা খাতুন যিনি তার সময়ে ২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি মাদ্ররাসাতুশ শামিয়া আল বারানিয়্যা (১১৮৬ খ্রি.)।

দ্বিতীয়টি হলো মাদ্ররাসাতুশ শামিয়া আল জাওয়ানিয়া। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা। মুসলিম জনহিতকর কাজের জন্য ছিলেন বিখ্যাত। জিহাতুস সলাহ আদির কারিমা ছিলেন ইয়েমেনের শাসক আলী দাউদের মা। যিনি জুবাইদ শহরের মাদ্রাসায়ে ইসলাহিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাতার হাজ্জাজিয়্যা (মালিক নাসির মুহাম্মদ বিন

কালাউনের মেয়ে) যিনি ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসায়ে হাজ্জাজিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। খাওয়ান্দ বারাকাহ যিনি ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসা উম্মুস সুলতান প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ও চিকিৎসক হিসাবেও নারীর ব্যাপক অবদান আছে। যেমন-সাহাবি উম্মে সুলাইমের। আইনশাস্ত্রে ছিল অধিক পাণ্ডিত্ববান নারী । যেমন-ওমর (রা.)-এর যুগে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। এমনকি রাজনীতি শিক্ষায়ও নারীর ভূমিকা ছিল। যেমন-আলী (রা.)-এর যুগে আয়েশা (রা.)। যা নারীর রাজনীতি ও শিক্ষায় উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা এবং সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকানের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো মুসলিম নারীর সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ।

ইসলামের শিক্ষাবিস্তারে নারীর অবদান কতটুকু তা চোখ বন্ধ করেই অনুধাবন করা যায়। আর এ নারীর অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনুল কাইয়িম (রা.) বলেন, সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীই যেন পুরো সমাজ।

পরিচ্ছেদ ৬:- জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের ভুমিকা। কুরআন ও হাদিস চর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান।

জ্ঞান চর্চায় মুসলিম নারীদের ভুমিকা -

ইসলামের আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীদের সম্পর্কে অযৌক্তিক ও অন্যায্য চিন্তা ও ধারণা ছিল। নারীদের সঙ্গে অভদ্র ও নৃশংস আচরণও করা হতো। ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর নানাভাবে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম শুধু নারীদের পূর্ণ অধিকারই দেয়নি, সমাজের অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার এই শ্রেণিকে বৈধভাবে বহু কাজ করতে উৎসাহিত করেছে।

মুসলিম পুরুষরা যেমন প্রতিটি ধর্মীয় ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে, তেমনি নারীরাও অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। নবুয়তের যুগ থেকে খুলাফায়ে রাশেদিন, বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের যুগ পর্যন্ত তারা গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছে। তাদের সেই সব কৃতিত্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অবদানের কথা ইতিহাসবেত্তারা তবাকাত ও রিজাল শাস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই নারীদের অবদান স্মরণীয় করে রাখতে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হয়েছে।

যেমন—ইমাম তাবরানি (রহ.)-এর 'আশারাতুন নিসা', ইবনে তাইফুর (রহ.)-এর 'বালাগাতুন নিসা', ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রহ.)-এর 'আখবারুন নিসা', ইমাম সুয়ুতি (রহ.)-এর 'নুজহাতুল জুলাসা ফি আশআরিন নিসা' কিংবা গ্রন্থের শেষে 'কিতাবুন নিসা' শিরোনামে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নারীদের কথা বলা হয়েছে। আর মুসলিম নারীদের কৃতিত্ব ও অবদানের ওপর গ্রন্থ রচনার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (রহ.)-এর 'আল মারআতু ফিল কোরআন', মোহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদী (রহ.)-এর 'আল মারাআতুল মুসলিমাহ' এবং ডক্টর আকরাম নদভি (রহ.)-এর 'মুহাদ্দিসাত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম নারীদের অবদানের মহাসমুদ্র থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মণি-মাণিক্য এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো—

ফিকাহ ও ফতোয়া : ইবনে কাইয়্যুম (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, প্রায় ২২ জন নারী সাহাবি ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন। এর মধ্যে সাতজন উম্মাহাতুল মুমিনিন (নবীজির পূতঃপবিত্র স্ত্রী) ছিলেন। আর তাঁদের সবার মধ্যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) 'ফকিহুল উম্মাহ' উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আলাউদ্দিন সমরকন্দি (রহ.) (৫৩৯ হি.)-এর

মেয়ে ফাতিমা ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ফকিহ (ইসলামী আইনবিদ)। তিনি তাঁর বাবা ও স্বামীর কাছ থেকে ফতোয়া লেখা শিখেছিলেন। তাঁর স্বামী ইমাম আলাউদ্দিন আল কাসানি (রহ.) (৫৮৭ হি.) 'বাদায়েউস সানায়ে' সংকলন ও বিন্যস্ত করার সময় যখন তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিত, তখন তিনি তাঁকে সতর্ক ও সংশোধন করে দিতেন।(আল মুনতাজাম, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৯)

ইমাম তাকি উদ্দিন ইব্রাহিম (রহ.)-এর মেয়ে আমাতুর রহমান ফিকাহশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁকে 'সিত্তুল ফুকাহা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। (আল ইবার ফি খাবার মান গাবার, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৭)

কবিতা ও সাহিত্য : মুসলিম নারীরাও সাহিত্য ও কাব্যে বিশিষ্ট অবস্থান অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মহান কবি ও সাহিত্যিকও রয়েছেন। এর মধ্যে মরিয়ম বিনতে আবু ইয়াকুব (রহ.) ছিলেন আন্দালুসের একজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। তিনি নারীদের কবিতা ও সাহিত্যও শেখাতেন। (বুগয়াতুল মুলতামিস, পৃষ্ঠা-৫২৮)

অনুরূপভাবে বিখ্যাত মুহাদ্দিস জয়নাব বিনতে কামাল হাশমি (রহ.) ছিলেন মক্কার বুদ্ধিজীবী নারীদের একজন; সেই সঙ্গে কবিতার প্রতি অনুরাগীও ছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৯)

এছাড়া আন্দালুসের কবিদের মধ্যে গাসসানিয়াহ, ওয়াদি আশিয়া, নাজহুন প্রমুখ নারী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩০-৩৬)

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তার বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ক্যালিগ্রাফার ও লেখিকা : ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের সময়কালে অসংখ্য মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও বিকাশে কোনো অংশেই কম ভূমিকা পালন করেননি। লেখালেখি ও ক্যালিগ্রাফিতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এর মধ্যে ফখরুন নিসা শহিদা বিনতে আহমদ (রহ.) লেখিকা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি ভালো ও সুন্দর লিখতেন।
(আল মুনতাজাম, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮৮)
উম্মুল ফজল ফাতিমা বিনতে হাসান বিন আলী আল ইকরা (রহ.) ছিলেন বাগদাদের একজন বিখ্যাত ও সুপরিচিত লেখিকা। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, ফাতিমার সুন্দর হস্তলিপি দেখে দেখে মানুষ লেখা শিখত আর তিনি বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ইবনুল বাওয়াবের লেখা হুবহু নকল করতেন।(আল ইবার ফি খাবার মান গাবার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৬)
অনুরূপভাবে আমাতুল আজিজ খাদিজা বিনতে ইউসুফ (রহ.) ছিলেন একজন আলেমা, পণ্ডিত ও মুহাদ্দিস। তিনি ক্যালিগ্রাফির জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, তিনি ক্যালিগ্রাফারের একটি দল থেকে ক্যালিগ্রাফি শিখেছেন। (প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৮)
এ ছাড়া বহু মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ আছে, যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও বিজ্ঞ ছিলেন।
কারিগরি শিক্ষা :মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্পকাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।
~নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তার চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো। সাহাবি উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘‘আমি উম্মূল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।
জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবিদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব

মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে লোক আসত।" (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১১৮)

হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবিদের ইজতিহাদি রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তার কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তার থেকেই বর্ণিত হয়েছে।' (ফাতহুল বারী, ৭ম খ-, পৃ. ৮২-৮৩)

হাফিয ইবনে হাজার রহ. অন্য এক স্থানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদিস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি'য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ। (ফাতহুল বারী)

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার জ্ঞান ভান্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তার খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন

বিষয় এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তার নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই। সাহাবিগণের ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন : "সাহাবিগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মুমিনিনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করলে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।" (যাদুল মাআদ, ৪র্থ খ-, পৃ. ২২১)

রুবাই বিনতে মুআওয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবি ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও কখনো কখনো তার নিকট হাজির হতেন। এ থেকেই তার জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রুবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে, উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবি ছিলেন। তার নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার হাদিসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবিগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শাবীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবেয়ীগণও তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. লিখেছেন, "তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তার বর্ণিত হাদিসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবেয়ী আলিমগণ তার নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তার থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন।"

সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ুব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা রহ.-এর কাছে গিয়ে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

মহান আল্লাহ আমাদের সমাজের নারীদেরও এভাবে গড়ে উঠার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআন ও হাদিস চর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান :-

কুরআন ও হাদীস চর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান অপরিসীম, যা ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। নবী (সাঃ) এর সময়ে ও পরবর্তীতে অনেক মহিলা সাহাবী হাদীস সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যেমন উম্মে সালামা (রাঃ) ও আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ)। ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক উভয় যুগেই মহিলা পণ্ডিতরা (আলিমাহ বা শায়খা) হাদীস গবেষণা, শিক্ষাদান এবং ধর্মীয় জ্ঞানে অবদান রেখেছেন।

উলুমুল কোরআন (কোরআন অধ্যয়নের বিজ্ঞান) : নবীযুগ থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য নারী এসেছেন, যাঁরা কোরআনের হাফেজ, কারি ও তাফসিরবিদ ছিলেন।

ইমামুল কুররা ইবনে জাজারি (রহ.) তাঁর মেয়ে সালমা সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি 'কিরাতে সাবআ' অর্থাৎ সাত কিরাতের ওপর কোরআন মুখস্থ করেছিলেন, এমনকি তিনি 'কিরাতে আশারাহ' তথা ১০ কিরাতেও তিলাওয়াত করতেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় কারি, হাফেজ ও উলুমুল কোরআনের পণ্ডিত ছিলেন।

(তবাকাতে মুফাসসিরিন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১০)

মুহাম্মদ বিন সিরিন (রহ.)-এর বোন হাফসা বিনতে সিরিন মাত্র ১২ বছর বয়সে তাফসিরসহ কোরআন মুখস্থ করেছিলেন, এমনকি মুহাম্মদ বিন সিরিন (রহ.)-ও এই শাস্ত্রে তাঁর বোনের থেকে জ্ঞানার্জন করতেন। তিনি তাজবিদ ও কিরাত শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। (তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪০৯)

হাদিসশাস্ত্র : যুগে যুগে মুসলিম নারীরা সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করেছেন।আল ইকদুস সামিন, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩)

উম্মে আলী তাকিয়া বিনতে আবুল ফারাজ গিয়াস বিন আলী আস সুরিয়া আল বাগদাদি (রহ.) বাগদাদ থেকে মিসরে যান, সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ইমাম আবু তাহির আহমদ বিন মুহাম্মদ জুলফি (রহ.)-এর কাছ থেকে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জন করেন।উম্মে মুহাম্মদ ফাতিমা বিনতে নাফিসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন হুসাইন (রহ.) সিরিয়া থেকে মিসর ও ত্রিপোলি ভ্রমণ করে তাঁর চাচার কাছে হাদিস শিক্ষালাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ইলমে হাদিস ও অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। (প্রাগুক্ত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭৩).

উম্মে মুহাম্মদ জয়নাব বিনতে আহমাদ বিন উমর (রহ.)-এর জন্মভূমি ছিল বায়তুল মাকদিস। ইমাম জাহাবি (রহ.) তাঁকে 'আল মামারুল রাহিলা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

কারণ তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তের দেশে ভ্রমণ করতেন। এই নারী মুহাদ্দিস যখন কোনো মুহাদ্দিসের দরসে যেতেন, তখন তাঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকত। তবে তিনি সাধারণত নিজের বাড়িতেই হাদিস পড়াতেন আর হাদিসপিপাসু ছাত্ররা সেখানে এসে উপকৃত হতেন। (আল ইবার ফি খাবার মান গাবার, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৬).ইমাম জাহাবি (রহ.) আজিবা বিনতে মুহাম্মদ বিন আবু গালিব আল বাগদাদি (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ১০ খণ্ডে তাঁর শিক্ষক ও ওস্তাদদের জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। (প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৪)

ঐতিহাসিক অবদান

- **সাহাবী যুগ:** হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) সহ অনেক মহিলা সাহাবী, বিশেষ করে নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হাদীস বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে ইসলামের জ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) একাই ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- **পরবর্তী যুগ:** আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও অনেক মহিলা হাদীসবেত্তা ও পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়।
- **আধুনিক যুগ:** আধুনিক যুগেও মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান রয়েছে। 'আল-ওয়াফা বিআসমায়িন নিসা' নামক ৪৩ খণ্ডের একটি বিশাল গ্রন্থে ১০ হাজারেরও বেশি নারী স্কলার ও হাদীসবেত্তাদের জীবন ও কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আধুনিক অবদান

- **শিক্ষা ও গবেষণা:** বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে মহিলা পণ্ডিতদের সংখ্যা এবং তাদের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নারী শিক্ষাবিদ হাদীস গবেষণা, শিক্ষাদান, এবং ইসলামিক জ্ঞানচর্চায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।
- **আন্তর্জাতিক অবদান:** কিছু মহিলা শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অবদান রেখেছেন। যেমন, একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিজ্ঞান কলেজের ফেলো ছিলেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন।
- **প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান:** কিছু মহিলা শিক্ষাবিদ আধুনিক যুগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ দিক

- ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহ্যবাহী 'আলিমাহ' বা 'শায়খা' হিসেবে প্রশিক্ষিত মহিলা পণ্ডিতদের ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৭ :সহশিক্ষা,নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, চ্যানেন্জ সমাধান ওপ্রসারের উপায় -

৭.১ সহশিক্ষা-

সুশিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আদর্শবান শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। সেকারণে তাদেরকে অবশ্যই সৎ ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সৎ ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলার মহান কারিগর। আর চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্র হ'ল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মানব জীবনে অপরিহার্য হ'লেও প্রচলিত এই সহশিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে। নাস্তিকরা এটিকে 'প্রগতি' ও 'সমতা'র প্রতীক মনে করে। অথচ বাস্তবে এটি মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈতিক বিপর্যয়ের প্রধানতম উৎস। আলোচ্য নিবন্ধে সহশিক্ষার কুপ্রভাব এবং ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিধৃত হ'ল।-

ক.সহশিক্ষা কি? Co-education বা সহশিক্ষাকে সংক্ষেপে কো-এড বলা হয়। যেখানে ছেলে ও মেয়ে একইসঙ্গে, একই ক্লাসে, একই রুমে পড়ালেখা করে।

খ.সহশিক্ষার সূত্রপাত : ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সহশিক্ষা পদ্ধতি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সহশিক্ষা নামক বিষফোঁড়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে সহশিক্ষা নামক এই ভাইরাস। তবে বহু মুসলিম দেশে এখনো মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

গ.সহশিক্ষার কুপ্রভাব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ :

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হাযার হাযার শিক্ষার্থী পড়ালেখা সমাপ্ত করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কর্মরত আছে। তাদের অনেকে মারাত্মক দুশ্চরিত্র ও চরম দুর্নীতিবাজ। প্রশ্ন হ'ল, উচ্চশিক্ষা লাভ করেও তারা চরিত্রহীন হ'ল কেন? যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চরিত্রবান লোক বের হওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে বের হচ্ছে চরিত্রহীন, লম্পট, প্রতারক। এজন্য মূলত আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষা নামক আত্মঘাতি ব্যবস্থা চালু আছে। যা ছাত্রজীবন থেকেই আমাদের চরিত্র ধ্বংসে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত ৯০% মুসলিম প্রধান দেশে যা আদৌ কাম্য হ'তে পারে না। নিম্নে সহশিক্ষার কুপ্রভাব তুলে ধরা হ'ল।-

১. সহশিক্ষা সংক্রামক ব্যাধির চাইতেও ভয়াবহ : সহশিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অতি অল্প বয়সে চরিত্রহীন হ'তে সহায়তা করছে। কেননা সহশিক্ষায় রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ

চলাফেরার সুযোগ। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা একাকার হয়ে মিলেমিশে চলাফেরা করে। এখানে ইসলামের অমোঘ বিধান পর্দাব্যবস্থা মানা হয় না। সেটাই হচ্ছে সহশিক্ষা। এই সহশিক্ষা নামক সংক্রামক ব্যাধিই শিক্ষার্থীদের চরিত্রকে চরমভাবে কলুষিত করছে।

২. ইসলামের দর্পণে সহশিক্ষা : সহশিক্ষায় ইসলামী পর্দার বিধানকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। যারা পর্দা মেনে চলতে চায়, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। যারা যত নগ্নভাবে চলে তাদেরকে সাধুবাদ দেয়া হয়। সহশিক্ষা মানেই পর্দাহীনতা। কলেজ-ভার্সিটির সর্বত্র চলছে আজ নগণতা, অশ্লীলতা ও অবৈধ প্রেম-প্রীতি। প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা আজ মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সহশিক্ষার কুপ্রভাবে বিপর্যস্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল উন্নত চরিত্র গঠন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় চরিত্র নষ্ট হয় এবং অবাধ যৌনাচারের পথ দেখায়, সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের কি লাভ হচ্ছে? এ শিক্ষার মাধ্যমে জাতি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক উন্নয়ন ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। দিন শেষে অমানবিক, অনৈতিক ও চরিত্রহীন মানুষে পরিণত হচ্ছে।
ইসলামে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ। কেননা এটি নৈতিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এটি স্বেচ্ছাচারিতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বহু স্থানে নারী ও পুরুষের একাকার হওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ২৪/১৯)*।

৩. সহশিক্ষায় চোখের যেনা : ক্লাসের ফাঁকে চোখের চোরা চাহনির লোলুপ আক্রমণে সহশিক্ষার অভিসারীরা পরস্পরে চোখের যেনায় লিপ্ত হয়। অথচ চোখের যেনা ও লজ্জাস্থানের যেনা থেকে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যা সে অবশ্যই লাভ করবে। যেমন- চোখের যেনা হ'ল দেখা, জিহবার যেনা হ'ল কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল চলা। আর মন সেটার আকাঙ্ক্ষা করে ও কামনা করে। আর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[মুসলিম, বুখারী]

৪.সহশিক্ষায় সতীত্ব হরণ : পরিণত বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য সহশিক্ষার ফলে সতীত্ব হরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারা ছুটির সময়ে বিভিন্ন পার্কে, রাস্তার ধারে, আড়ালে-আবডালে প্রেম বিনিময় করে। এর মাধ্যমে সতীত্ব হারানোর মরণযাত্রা শুরু হয়। অথচ রাসূল (সা:)

বলেন,لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانِ- 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোনও পরনারীর সঙ্গে নির্জনে একাকী না হয়, কারণ তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান'।[তিরমিজি] এমনকি হজ্জের পবিত্র সফরেও একাকী গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ : اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ- 'কোন পুরুষ যেন কখনও কোন নারীর সাথে একত্রিত না হয় এবং কোন নারী যেন মাহরাম ব্যতীত একাকী ভ্রমণে বের না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা:)! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে, আর আমার স্ত্রী একাকী হজ্জের সফরে রওয়ানা হয়েছে। রাসূল বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জব্রত পালন কর'।

৫. বেপর্দা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জন্ম দেয় : সহশিক্ষা শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক গোপনীয়তা ও পর্দার সীমা ধ্বংস করে দেয়। তারা একে অপরের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করে, যা ইসলাম সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। বেহায়াপনার বিপরীতে লজ্জাশীলতাকে ইসলাম আবশ্যক গণ্য করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ- 'বিগত নবী-রাসূলগণের সর্বসম্মত বাণী সমূহ যা মানব জাতি প্রাপ্ত হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার'।অন্যদিকে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق، 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

৬.বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্ক : সহশিক্ষা থেকে বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেম-প্রীতি, বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, চ্যাটিং, ডেটিং হয়ে থাকে। বিপরীত লিঙ্গের চৌম্বিক আকর্ষণে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। আবার এসব অবৈধ সম্পর্ক থেকে যেনা-ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত হয়। অতএব জাতির পরবর্তী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অনতিবিলম্বে সহশিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যথা তারা নৈতিকতা বিবর্জিত এক অথর্ব জাতিতে পরিণত হবে।

৭. পর্দার বিধান লঙ্ঘন : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা শরী'আত বিরোধী কাজ। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাবধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতি-নৈতিকতার জন্য চরম ক্ষতিকর। যরূরী প্রয়োজনে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের হ'তে হ'লে সৌন্দর্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে বের হ'তে বলা হয়েছে। তারা আপাদমস্তক ঢেকে

বের হবে। কারণ মহিলারা আবৃত থাকার জন্য আদিষ্ট। আর যখন তারা বেপর্দা হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে কিভাবে তাদের দ্বারা গুনাহের কাজ করানো যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ- 'নারী হ'ল আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে'। পর্দার বিধান লঙ্ঘনের কারণে সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। আল্লাহ্র রহমত, বরকত উঠে যায়। আমাদের দেশে সহশিক্ষা ও কর্মস্থলে কারণে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় মারাত্মক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যার কুপ্রভাব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক এবং বিবাহ পরবর্তী পরকীয়া। যা ইসলামের শান্তিপূর্ণ পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৮.চারিত্রিক অবক্ষয় ও লজ্জাশীলতা ধ্বংস : শালীনতা ও লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করে দেয় সহশিক্ষা। অথচ শালীনতা ও লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হাদীছে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) একবার জনৈক আনছারী ছাহাবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ভাইকে লজ্জা-শরম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ ওকে ছাড়ো! কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ'।[বুখারি] অন্যত্র তিনি বলেন,اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ- 'লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই আনায়ন করে। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'লজ্জাশীলতার সবটুকু কেবলই মঙ্গল'।[বুখারী] তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ. وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ- 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানদার জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা মন্দ কাজ। আর মন্দ লোক জাহান্নামে যাবে'।[তিরমিজি]

৯. বিকৃত মানসিকতা ও ডিপ্রেশন : সহশিক্ষার ফলে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রেমঘটিত প্রত্যাখ্যান, প্রতারণা, ব্রেক-আপ, ছ্যাঁকা-ছলনা, মান-অভিমান থেকে আত্মহত্যা, এমনকি খুনাখুনির মতো ঘটনাও ঘটে যায়। অতএব অভিভাবকদের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হ'তে সন্তানকে দূরে রাখা কর্তব্য।

১০. ইসলামী আদব-শিষ্টাচার ভূলুণ্ঠিত : যারা ইসলামী পর্দা, আখলাক, চরিত্র, শালীনতা, লজ্জাশীলতা, সৃজনশীলতা, নম্রতা-ভদ্রতা ধরে রাখতে চায়, তারা সহশিক্ষা ব্যবস্থায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইসলামী শিষ্টাচার, আদব-আখলাক চরমভাবে উপেক্ষিত। প্রতিষ্ঠান থেকে পর্দার কোন নির্দেশনা থাকে না। সচেতন অভিভাবক ও তাক্বওয়াশীল শিক্ষার্থীরা নিজস্ব উদ্যোগে যতটুকু পর্দা মেনে চলে, কেবল ততটুকুই।

ঘ.সহশিক্ষার ভয়াবহতা হ'তে বাঁচতে আমাদের করণীয় : এতক্ষণ ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষার ভয়াবহতা উপস্থাপন করা হ'ল। এক্ষণে আমরা সহশিক্ষার ভয়াবহতা হ'তে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১.ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা অথবা একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষিকা ও ছেলেদের জন্য পুরুষ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. ইসলামি শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ:-মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ আধুনিক শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। বিগত যুগে ইসলামী শিক্ষার বরকতেই মুসলমানগণ হাজার বছর যাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। এখন সহশিক্ষা এসে সব ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে।

৩.সহশিক্ষার বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা:- সহশিক্ষা মূলত শয়তানী ফাঁদ। এই চোরাগলিতে প্রবেশ করেই অধিকাংশ মুসলিম তাদের ঈমানী শক্তিকে শয়তানের কাছে যিম্মী করে ফেলে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

৪.বৈষম্য মুকল শিক্ষানীতির সংস্কার করা:- দেশে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির সংস্কার করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। স্কুল-কলেজে বিদ্যমান পাঠ্যবই অধ্যয়ণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঈমানহারা, ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী ও হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে জাতীয় শিক্ষাবোর্ড সহ অন্যান্য সকল বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদগুলোতে মুসলমানদের বাদ দিয়ে হিন্দুদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির সংস্কার করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. মিডিয়ায় ইসলামি দাওয়াহ ও গনসচেতনতা বৃদ্ধি করা :-সহশিক্ষার কুপ্রভাব, সহশিক্ষার ভয়াবহতা শিরোণামে বক্তৃতা-বিবৃতি, লিফলেট, গণসংযোগ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আবৃত্তি, অডিও-ভিডিও কন্টেন্ট প্রচার সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ জোরদার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সহশিক্ষার কুফল সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি স্তরে সাধ্যমতো প্রচারণা চালাতে হবে।

৬. ইসলামি শিক্ষাকে প্রাধান্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া :- ইসলামী শিক্ষা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম। দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা:- অহি-র জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই হ'ল ইসলামী শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যরূরী। কেননা ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ

সাধনের মধ্যেই বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিহিত। এমনকি ইসলামী শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চিত গ্যারান্টি।
সুতরাং সহশিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী পর্দা, শালীনতা ও চরিত্র গঠনের বিপরীতমুখী একটি ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা। এটি সমাজে যেনা-ব্যভিচার, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের কারণ। মুসলিমপ্রধান দেশ হিসাবে আমাদের উচিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সন্তানদের নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ও ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

৭.২-মেয়েদের দ্বীনি ইলম পড়ানোর উপকারিতা :-

মেয়েদের দ্বীনি ইলম বা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা হলো: তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে, আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করতে পারবে, সমাজে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং তাদের জীবনকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে পারবে।
প্রধান উপকারিতাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **পরিবারকে রক্ষা:** নিজেরা দ্বীনি ইলম শিখে তারা নিজেদের এবং তাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে।
- **সঠিক ইবাদত:** দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। এটি তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে সাহায্য করবে।
- **ইসলামের প্রসার:** জ্ঞানী নারীরা সমাজে ইসলামের সঠিক বার্তা ও জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
- **মনুষ্যত্বের বিকাশ:** ইলমে দ্বীন অর্জনের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- **জ্ঞান অর্জনের সুযোগ:** ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী, নারী-পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান অর্জনের অধিকার রয়েছে এবং দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহকে উৎসাহিত করা হয়।
- **সন্তানের প্রতি দায়িত্ব:** শিক্ষিতা মা তার সন্তানদেরকে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দিতে পারেন, যা তাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর হবে।

এ ব্যাপারে কুরআন হাদিস কি বলে - একটু আলোচনা করি -
হাদীস - اجران (ثلاثة لهم.....) যাতে নারীর শিক্ষার তাকীদ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা তালাশ করা যাক । ফতহুলবারী গ্রন্থে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বুখারী শরীফের যে ঋণ উম্মতের উপর ছিল তা তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ দ্বারা পুরো হয়ে গিয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে- আল্লাহর ফরজ বিধান ও রাসূলের সুন্নাত বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন। আর হাদিসে

উল্লেখিত নারীশিক্ষা দ্বারা আমাদের সালফে সালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী দ্বীনি মুরব্বিগণ) দ্বীনী শিক্ষাই বুঝেছেন। আমি একথা বলছি না যে, নারী সমস্তেরই মহিলা মাদরাসায় পড়া উচিৎ বরং দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তর রয়েছে। মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনি ইলমের বুৎপত্তি অর্জন। প্রথমস্তর যেমন প্রত্যেক নারীর উপর ফরজ তেমনি দ্বিতীয় স্তরও ফরজে কেফায়া । অথ্যাৎ, উম্মতের বিশেষ এক নারী সম্প্রদায় যদি দ্বীনি ইলমে বুৎপত্তি অর্জন না করেন, নারীদের দৈনন্দিন হাজারো মাসআলা নিরসনে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় না করেন, তাহলে প্রতিটি নারী উম্মত গুনাহগার হবে।
একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেখা যাক যে, শিক্ষার্থী ক্লাসের সব বিষয়ের মৌলিক তথ্য গুলো Explain ছাড়া শুধু আয়ত্ব করে আসে সে পরিক্ষার হলে বিস্তারিত উত্তর লিখতে পারে না, ফলে তার নম্বরও মৌলিক তথ্যের উপর আসে। ব্যাখ্যা না করায় দেখা যায় সে ১০০ তে ৪০/৫০ নম্বর পায়। পক্ষান্তরে যে ছাত্রীটি প্রতিটি বিষেয়ে ব্যাখ্যা সহকারে আয়ত্ব করে পরিক্ষা দেয় সে পুরো ১০০ নম্বরের উত্তর দেয় এবং সে অনুযায়ী নম্বর পায়। কোন বিষয়ের মৌলিক তথ্য দুজনেই জানে তবে দ্বিতীয়জন পূর্ণরূপে জানে যদ্দরুন বোর্ড থেকে পরিদর্শক মহোদয় এলে সে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিষ্ঠানের মান বাঁচায়। এখন যদি অন্যরা বলে যে, এতো বিস্তারিত জেনে লাভ কি? মৌলিক শিক্ষা অর্জন হলেই তো যথেষ্ট। তাহলে অন্যরা অবশ্যই ভুল পথেই কেবল নয় বরং সারা জীবন ঐ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজনে উক্ত ভাল ছাত্রীর দারস্থ ও তার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। আর দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তরও অনুরূপ। দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটির (যা সীমীত) অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হওয়া অবধারিত। তাই দ্বিতীয়টির সুষ্ঠু পরিচর্যা একান্ত কাম্য। আর কওমী মাদরাসামূহ-ই সেই খেদমত সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে।। যারা দ্বীনি ইলমে গভীরতা অর্জনের জন্য দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে টিকিয়ে রাখার জন্য এ মহান ফরয কোন পার্থিব পদমর্যাদার সম্মান ও আর্থিক সম্মানের লোভ ছাড়াই মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিখে যাচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারে নারীর নৈতিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে , হাজারো সালাম সেসব নক্ষত্রসম মানবদের তরে।প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ইলমে ওহীর হক নিয়ে কিছু বলাটা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। আমাদের যারা ইলমে দ্বীন শিখছেন এই ইলমের কি হক এদের উপর বর্তায় এবং এই হক আদায় না করলে কি পরিণতি আমাদের বরণ করতে হবে?

ইলমে ওহীর হক সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته অর্থ-আপনার নিকটে আপনার রব যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে যেন আপনি রিসালাতের দায়িত্বই পৌঁছান নি। সূরা আর-রহমানে ইরশাদ হচ্ছে- علم القرآن অর্থ: তিনি কুরআন

শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমোক্ত আয়াতে " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে " তা ছিল কুরআন, ওহী এমন ইলম যা সরাসরি শিক্ষক মহান রাব্বুল আলামীন থেকে নবীজি (স:) পেয়েছেন। মহান রব এই ওহী অবতীর্ণের সাথে সাথে তার যিম্মাদারী বা হক সম্পর্কেও রাসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সম্বোধন করেছেন এভাবে- " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তার প্রচার করুন।" অর্থাৎ ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়া, এটা এর অন্যতম হক। এ সম্পর্কে নবীজি সা: ও বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন- যেমন তিনি বলেন- بلغوا عني و لو اية " আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও।

অন্য এক হাদীসে এসেছে-تعلموا العلم والفراءض و علموه الناس فاني مقبوض "তোমরা ইলম ও ফারায়েযের জ্ঞান শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে তুলে নেয়া হবে।"

আর আমরা তাঁর উম্মতের নির্বাচিত অংশ যারা নায়েবে রাসূল ও নবীর ওয়ারিশ " সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত। আমাদের উপরেও ইলমে ওহী শিক্ষার এই হক্ব তথা প্রচার প্রসার এর দায়িত্ব বর্তাবে। উম্মত গোমরাহ হচ্ছে আর আমাদের হক্ব আমাদেরকে আহ্বান করছে। আমরা ইলমের প্রচার-প্রসারে অংশ নিয়ে দ্বীনি ইলমের এই হক্বকে আদায় করতে সচেষ্ট হই। দ্বিতীয় অবশ্যপালনীয় হক্ব হলো, নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করা। এ হক্বের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।যেমন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন- من علم بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم - دلاءل النبوة للامام بيهقي "যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন।।

অন্য হাদীসে এসেছে - ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره "যেসব আমলের সওয়াব মুমিনের মৃত্যুর পরও সে পেতে থাকে, তার মধ্যে একটি হলো ঐ ইলম- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে।

আমরা নিজেদের দিকে একটু দেখি, আমরা পূর্ণরূপে দ্বীনের উপর চলতে পারছিতো? মাদরাসা থেকে বোরকা পড়ে বাসায় যাচ্ছি, সেখানে আমার চালচলন ঠিক আছে তো? যেহেতু ইলমে ওহী আমার সীনায়, উম্মত যেন আমাকে দেখে নিরাশ না হয়। ইলমে দ্বীন থেকে ওদের ভরসা যেন না ওঠে যায়। উপরন্তু বেপর্দা নারীরা পর্দানশীন হতে পারে এবং বেহায়াপনা লোপ পায়। এখন আমি যদি মাহরাম ছাড়া প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঘনঘন বাইরে ঘোরাফেরা করি, কণ্ঠের পর্দা ভুলে গিয়ে উচ্চস্বরে জিনিসের দরদাম করতে থাকি, তাহলে ইলমে ওহীর যে হক্ব আমার উপর রয়েছে তার অপমান করলাম। মূলত: কথার দাওয়াত থেকে নিশ্চুপ দাওয়াত বেশি কার্যকরী। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবার দরকার যে, এই হক্ব আমাদের দ্বারা আদায় না হলে কি হবে? প্রথমত: আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট নাফরমানী হবে। যেখানে সূরা মায়েদাতে স্বয়ং নবীজিকে সাবধান করা হয়েছে তার

হক্ক সম্পর্কে যে, “যদি কুরআনের তাবলীগ না করেন, তবে যেন রিসালাতের দ্বায়িত্বই আপনি পৌঁছান নি।" সেখানে আমরা কোন ছাড় পাব? উপরন্ত নবীজি সা. তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে গেছেন । যার প্রমাণ হলো তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বলেছিলেন- اللهم اشهد এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাকী রইল নবীর নায়েবগণ, তাঁদের জন্য এই সতর্কবাণী প্রত্যেকের উপর তার দায়িত্ব পূর্ণ না করা পর্যন্ত বহাল
থাকবে।

এবার দ্বিতীয় হক্ক সম্পর্কেও সচেতন থাকা চাই। তথা ইলম অনুযায়ী আমল করা যার ব্যাপারে উদাসীনদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব ধমকি এসেছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- কতক জান্নাতী নিজেদের ধর্মীয় গুরুদেরকে দোযখে দেখে আশ্চর্য হলে, তারা তাদের সংশয় এ বলে দূর করবে যে, “আমরা অন্যদেরকে আমল করতে বলতাম কিন্তু নিজেরা আমল করতাম না।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে - ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه

“সেই আলেম কেয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অপর এক হাদীসে এসেছে- কেয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের উভয় পা নিজস্থান থেকে সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি হলো ইলম সম্পর্কে।

ومن علمه فيما عمل

নিজের ইলমের উপর কি আমল করেছো?" অতএব, মুমিন মাত্রই এসব ধর্মকির প্রতি যথাযথ সজাগ থাকা চাই। আর আমরা যেহেতু ইলমে ওহীর ধারক-বাহক, উম্মাহর ঐ সকল মহীয়সী রমণীদের উত্তরসূরী, যারা স্বীয় ইলমের হক আমল ও প্রচারের মাধ্যমে আদায় করে ইতিহাসে চির স্মরণীয় ও সম্মানিত হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ আমাদের ইলমের হক্ক বুঝে তা যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমীন।

৭.৩-পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ও শিক্ষা দেওয়া জরুরি :-

বাচ্চাদের জীবন গঠনের জন্য মহিলাদের শিক্ষার প্রতি যত্ন বান হওয়া অপরিহার্য। মহিলা সংশোধন না হলে পুরুষের অসুবিধা কারণ বাচ্চা অধিকাংশ মায়ের কোলে লালিত পালিত হয়। তাদের জীবে মায়ের আমল - আখলাকের অনেক প্রভাব পরে। বিজ্ঞানীরা বলেন বাচ্চা যে বয়সে আকলের (বুদ্ধির) প্রথম ধাপ অতিক্রম করে তখন সে কথা বলতে পারে না ঠিক, তবে প্রত্যেক কথা ও কাজ তার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে যায়। এজন্য তার সামনে কোন অনুচিত কাজ কথা বা অশোভন আচরন করা ঠিক নয়। সর্ব প্রকার অমার্জিত ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন কোন বিজ্ঞানী তো এটাও লিখেছেন যে, বাচ্চা যখন মায়ের গর্ভে

থাকে তখনও মায়ের কাজের প্রভাব তার উপরে পরে।এজন্য মায়েদের শিক্ষা দান ও সংশোধন জরুরি। ছেলেরাতো মায়ের আচল থেকে বের হয়ে ওস্তাদ ও বুযুর্গদের সোহবতে থেকে শিখতে পারে এবং জীবন গঠন করতে পারে। মেয়েদের তো সেই সুযোগ নেই, তারা সর্বদা ঘরে থাকে। তাদের জন্য এটাই উত্তম পদ্ধতি।সুতরাং মহিলাদের মধ্যে কেও কেও উচ্চ পর্যায়ে ইলমে দ্বীন শিখবে। তাদের মধ্যেমে নারী জাতির ইসলাহ সহজ হবে। কেননা পুরুষ আলেম হওয়ার দ্বারা নারীদের উপর ইসলাহ হয় না। মেয়েদের সংশোধন না হওয়ার সম্পুর্ন দায়ভার (আল্লাহ রহম করুন) পিতা- মাতার উপর। তারা তাদের তালিমের ব্যাপারে যত্নশীল নয়।

৭.৪দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা :-

ইলমে দীন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত; নেয়ামতের শোকরগুজারীর পদ্ধতি

এরপর একই বিষয়বস্তু আল্লাহ তা'আলা ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। ইরশাদ করেন, وأتممت عليكم نعمتي অর্থ, আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। অর্থাৎ দীন যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ করেছেন, এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। নেয়ামতের শোকরগুজারী আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি আমার নেয়ামতের শুকরিয়া করো আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দিবো। আর যদি নাশোকরী করো (জেনে রেখো) আমার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

আয়াতের এ অংশে যে জিনিসকে নেয়ামত বলা হল, সে জিনিসকেই প্রথম অংশে দীন বলা হয়েছে। আর এখানে 'দীন' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'আহকাম'। সুতরাং আহকামকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত বললেন। প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন হয়। সম্পদের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি হল, জায়েয পন্থায় উপার্জন করা এবং জায়েয পথে খরচ করা। কিন্তু কেউ যদি জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া না করে সম্পদ উপার্জন করে কিংবা উপার্জন করল জায়েয পন্থায় কিন্তু ব্যয় করল যেখানে সেখানে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করল না। এতে মালের শুকরিয়া তো করা হল না; বরং নাশোকরিই হল।

তদ্রূপ কারো সন্তান আছে। তো সন্তানের ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায়ের এক পন্থা, আবার স্ত্রী থাকলে তার ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায়ের ভিন্ন পন্থা। অনুরূপ পিতা-মাতা থাকলে তাদের শুকরিয়া আদায়ের পন্থাও অন্য রকম।

দীনও এক বড় নেয়ামত। এর শুকরিয়া আদায়ের পন্থা হল, দীনের বিধি-বিধান মেনে চলা। সে অনুযায়ী আমল করা।

নাজাতের একমাত্র পথ দীনে ইসলাম

ঠিক একই বিষয়বস্তু আল্লাহ তা'আলা আরেকভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ورضيت لكم الاسلام دينا অর্থ, আমি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছি দীনে ইসলামকে। অর্থাৎ এ দীন নিয়ে আমার কাছে আসতে পারলে জান্নাতের নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত হবে, অন্যথায় মাহরুম থাকবে। ইসলাম কী? ইসলাম তো আহকামের নাম। ঈমান হল আকীদার নাম। ঈমানের অর্থ, অন্তরে বিশ্বাস করা, আর ইসলামের অর্থ হল, মাথা পেতে মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা যে আহকামের কথা বলেছেন তার সামনে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া। যে ব্যক্তি ইসলামকে এভাবে মেনে নিল সেই উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إنا عرضنا الأمانة على السموات আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল ও শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ।

ইসলামে পরিপূর্ণ দাখেল হতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. অর্থ : হে মুমিন সকল! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর। আয়াতে কারীমায় ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। কারণ কেউ এমনও হতে পারে যে, তার এক পা ইসলামের নৌকায় আর অপর পা অন্য নৌকায়। বর্তমানে অনেক মুসলমান এমন রয়েছে, যে জুম'আর নামায পড়তে আসে, কিন্তু জুম'আর দিন আছরে আসে না, ফজরে আসে না। জুম'আয় আসা তো খারাপ কিছু নয়। কিন্তু জুম'আর দিন ফজর, আসরে না আসা হল অন্যায়। অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, কিন্তু চেহারা একেবারে পরিষ্কার; দাড়ি মুণ্ডায়। আল্লাহর রাসূলের চেহারার সাথে তার কোন প্রকার মুহাব্বত নেই; বরং বিদ্বেষ। তাহলে এ ব্যক্তি যে নামায পড়ছে, কার আনিত হুকুমের উপর আমল করছে?

এমন মুসলমানের ব্যাপারে বলা হয় এক পা ইসলামে, এক পা বাইরে। এক পা রাসূলের আনুগত্যের জন্য সঁপে দিয়েছে অপর পা সঁপেছে চাকুরী, ফ্যাশন ইত্যাদি পালনের জন্য।

শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত

এখন আমরা মূল বিষয়ের আলোচনায় আসি। শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। **(এক)** দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা, **(দুই)** দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যবস্থা। কুরআন- হাদীসে এই দুই শিক্ষা ধারার স্তর ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়েছে। একটিকে ‘জরুরী' বলা হয়েছে। অপরটিকে 'পছন্দনীয় বলা হয়েছে। উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বলা হয়েছে।

শরীয়তে এভাবেই মাসআলা- মাসাইলের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ হালাল রিযিক কামাই করা ফরয। কিন্তু এটা হল দ্বিতীয় স্তরের ফরয। হাদীসে এসেছে, كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. হালাল রুজি কামাই করা ফরয। কিন্তু তার অবস্থান হল প্রথম স্তরের ফরযের পর। উভয় স্তরের খেয়াল রেখে চলা আবশ্যক। নামায, রোযা এবং হজ্জ

প্রথম স্তরের ফরয। সুতরাং এই স্তরের ফরয আদায়ের পর হালাল রুযি কামাইয়ে মনোনিবেশ করতে হবে।

درکفے جام شریعت درکفے سندان عشق
ہرہوسنا کہ نہ داند جام وسندان باختن

অর্থ : অনভিজ্ঞ আশিক শরীয়তের নাযুক পেয়ালা আর ইশক ও মুহাব্বতের হামানদিস্তা নিয়ে খেলতে জানে না। কাচের পেয়ালায় লোহার কাঠির পরিমিত আঘাতে সুর-লহরী সৃষ্টি করা কাঁচা লোকের কাজ নয়। একমাত্র ঝুনো ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তা করতে পারঙ্গম। অর্থাৎ, এ ধরণের ব্যক্তিই উভয় ফরয নিয়ে একসাথে চলতে পারে। নামায পড়তে হবে, সময় মতো দোকান খুলতে হবে, চাকুরীর দায়িত্বও পুরা করতে হবে। সবদিক সামলে চলা সুকঠিন। কিন্তু বান্দা যখন হিম্মত করে আল্লাহ তা'আলা রাস্তা খুলে দেন।

দীন এবং দুনিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে দীনের অগ্রাধিকার হবে

যদি দীন-দুনিয়া মুখোমুখি হয়ে যায় এবং অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে প্রথম শ্রেণীকে প্রথম স্তরে আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে দ্বিতীয় স্তরে রাখতে হবে। নামায এবং দোকানদারীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে নামাযকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা; দোকান নয়। ইংল্যান্ডে এক যুবক কারখানায় চাকুরী করত। রমাযান মাস চলছিল। গরমও ছিল প্রচণ্ড। সে যোহরের সময় বসের কাছে নামাযের অনুমতি চাইল। বস অনুমতি দিল না। রোযা অবস্থায় স্ক্রু তো এমনিতেই ঢিলে থাকে। অর্থাৎ, মেজায মর্জি স্বাভাবিক থাকে না। অনুমতি না পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। চাকুরির পরওয়া না করে কোট গায়ে সোজা হাঁটা দিল। নিশ্চিন্ত মনে যোহর পড়ে আমার কাছে আসল। বলল, আমি তো এই এই করে এসেছি। বললাম, খুব ভাল করেছ। আল্লাহ তা'আলা তার অন্য আয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিলেন । এখন সে লোকদেরকে ড্রাইভিং শিখায়। বেশ কয়েকটা বাড়ির মালিক। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের জন্য দ্বিতীয় স্তরের ফরয ছেড়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অন্য রাস্তা খুলে দিবেন।

সারকথা হল, যতক্ষণ দুই স্তরের মধ্যে বিরোধ না দেখা দেয় 'জামে শরীয়ত' আর 'সানদানে ইশক' নিয়ে খেল। কিন্তু যখন বিরোধ দেখা দিবে দীনকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটাই শরীয়তের সবক এবং এতেই মুমিনের সফলতা।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইলমকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। 'জরুরী ইলম' হল দীনী শিক্ষা। দীনী শিক্ষা ছাড়া অন্যসব শিক্ষা পছন্দনীয়। হ্যাঁ, কিছু দুনিয়াবী ইলম হারাম। অর্থাৎ যে ধরণের জ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতিকর যেমন, যাদু-টোনা শেখা, জ্যোতিষশাস্ত্র শেখা, গান-বাজনা শেখা ইত্যাদি। এ ধরণের শিক্ষা অর্জন করা হারাম।

দীনী ইলম ছাড়া যত ইলম আছে সেগুলোকে দ্বিতীয় নম্বরে রাখা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,طلب العلم فريضة على كل مسلم. অর্থ : ইলমে দীন হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ হুকুম নারী পুরুষ সকলের জন্য বরাবর। পুরুষের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। এই হাদীসে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য দীনী ইলম। দুনিয়াবী ইলম বা জাগতিক জ্ঞান উদ্দেশ্য নয় এবং এক্ষেত্রে এ হাদীস ব্যাপকও নয়।

কিছু লোকের ভুল ধারণা রয়েছে। তারা এ হাদীসকে ব্যাপক মনে করে। দীনী ইলম এবং দুনিয়াবী ইলম উভয় ইলমকে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। এটা ঠিক নয়। তো ইলমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, العلم ثلاثة : آية محكمة اوسنة قائمة فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل অর্থাৎ জরুরী ইলম তিন ধরণের- **(১)** কুরআনে কারীমের ইলম (آية محكمة), **(২)** হাদীস শরীফের ইলম (سنة قائمة) এবং **(৩)** আহকামের ইলম অর্থাৎ ফিকহের ইলম (فريضة عادلة)। এছাড়া যত ইলম আছে সব হল পছন্দনীয় ইলম, সেগুলোরও ফযীলত আছে। সেই ইলমও মাথার তাজ (কিন্তু জরুরী নয়)। (وما سوى ذلك فهو فضل নাহব সরফের ইলম, আদব ইনশার মা'রিফাত, মানতিক- ফালসাফার যোগ্যতা, ইতিহাস শেখা, চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করা এ সবই ফযীলতের বিষয়। কিন্তু এগুলো হল দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান। প্রথম স্তরের ইলমের পর এর অবস্থান; তার আগে নয়। ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারও এমন। হিন্দি, ইংরেজি জানা খারাপ কিছু নয়; বরং পছন্দনীয়। কিন্তু জরুরী ইলমের মধ্যে এসব পড়ে না। প্রথমে কুরআন পড়তে ও জানতে হবে, এরপর অন্যান্য ভাষা।

তদ্রূপ মাদরাসাগুলোতে যে ইলম পড়ানো হয় সেগুলোও সব এক স্তরের নয়। মাদরাসায় যে ইলম পড়ানো হয় সেগুলো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) علوم عالية মৌলিক ইলম। (দুই) علوم آلية সহায়ক ইলম। অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান হল 'জরুরী ইলম' যে উদ্দেশ্যে মূলত এই মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকার ইলম তিন বা ছয় বিষয়ের ইলম। (১) কুরআন, (২) হাদীস, (৩) ফিকহ। এ তিন প্রকারের সঙ্গে এগুলোর মূলনীতি মিলানো হলে মোট ছয়টি বিষয় হবে। অর্থাৎ (৪) উসূলে তাফসীর, (৫) উসূলে হাদীস, (৬) উসূলে ফিকহ। এই ছয় প্রকারের ইলম হল 'জরুরী ইলম'। বাকী যে ইলম মাদরাসায় পড়ানো হয় সেগুলো হল ‘সহায়ক ইলম'। অর্থাৎ যে ইলম শেখানোর জন্য মাদরাসার প্রতিষ্ঠা তার সহায়ক ইলম। মাদরাসায় এগুলোকে সহায়ক হিসেবেই পড়ানো হয়; মূল হিসেবে নয়। তো 'জরুরী ইলম' এর সহায়ক ইলমই যেখানে ফরয ও উদ্দেশ্যের মর্যাদা রাখে না, তাহলে যে ইলম শুধু দুনিয়াবী লাভের জন্য শেখা হয় কীভাবে তা মূল এবং ফরযের মর্যাদা পেতে পারে? এ ধরণের ইলমকে বেশির চেয়ে বেশি 'সম্মান'-এর মর্যাদা দেয়া যেতে পারে, পছন্দনীয় বলা যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন হালকায় আধুনিক শিক্ষা এবং দ্বীনি মাদারিসকে কেন্দ্র করে একটা বিষয়ে খুব আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কিনা? হলে কীভাবে হওয়া চাই? এ বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনা নয়; বরং বিতর্কও হচ্ছে। এ অস্থিরতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে, মানুষ এ বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার শিকার হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভুল ধারণা ও বিতর্ক চলতেই থাকবে, যার কোন শেষ থাকবে না।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। আধুনিক শিক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াতে চলার জন্য যা যা প্রয়োজন, যেমন- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কমার্স, একাউন্টিংসহ আরো অন্যান্য যেসব বিষয় রয়েছে, বর্তমান সময়ে সেসব বিষয়কে আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর আমরা এসব শিক্ষার বিরোধী নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة

আয়াতের এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ- তোমরা যত পারো শক্তি অর্জন করো। এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে আমি আবারও বলছি, এর জন্য শর্ত হলো, টাকা উপার্জনের নিয়তে যেন না হয়; বরং শর্ত হলো খেদমতের নিয়তে হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হতে হবে। তাহলে বাহ্যিকভাবে ডাক্তারি, বিজ্ঞান, কমার্স, হিসাব, টেকনিক্যাল জ্ঞানসহ যে কোনো আধুনিক শিক্ষাতেই মৌলিকভাবে কোনো দোষ নেই; বরং তা অর্জন করা একটি স্তর পর্যন্ত ফরযে কেফায়া। কিন্তু বিষয়টির উপর অনর্থক আলোচনা ওখানেই শুরু হয়, যখন আধুনিক শিক্ষাকে মাদ্রাসার সাথে মিলানোর কথা বলা হয়। বলা হচ্ছে, মাদ্রাসাতেও আধুনিক শিক্ষা পড়ানো হোক। পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু পরিবর্তন করা চাই, যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী হয় এবং সে অনুযায়ী মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মাদরাসা শিক্ষিতরা সিপিএস অফিসার হওয়া চাই, প্রকৌশলী ও ডাক্তার হওয়া চাই। তো এখানেই মূলত বোঝাপড়ার সমস্যা দাঁড়ায়।

ভালোভাবে উপলব্ধি করা চাই যে, মাদ্রাসাসমূহে আধুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। যার মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্য সঠিক, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রথম উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের ছাত্রদের দুনিয়াবী জ্ঞানের এতোটুকু জানাশোনা হোক, যার মাধ্যমে তাদের আলোচনায় গুরুত্ব সৃষ্টি হবে এবং তারা যখন পৃথিবীতে দ্বীনের প্রচার প্রসার করবে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভাষা-পরিভাষায় দ্বীন প্রচার করতে পারবে।

ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং নিজের শুদ্ধির জন্য। আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার জন্য। আমাদেরকে এই নিয়ত করতে হবে। এই নিয়ত করে আমাদেরকে ইমাম মালেক (রহ.)এর সেই উক্তিটি স্মরণ করতে হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, العلم لايعطيك بعضه حتى تعطيه كله অর্থাৎ- ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত তার কিছু অংশ তোমাকে দিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সমগ্র অস্তিত্ব ইলমকে দিয়ে দিবে না। সুতরাং এখন কোমর বেঁধে বসতে হবে। এটা হবে না যে, আমি তালিবুল ইলমও হবো, আবার নামাযও কাযা করবো, মসজিদেও আসবো না, মোবাইলের অপব্যবহারও করবো। এতে করে প্রকৃত ইলম ও ইলমের উপকারিতা অর্জিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৭.৫-মেয়েদের জন্য ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার ক্ষতি :-

আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের জন্য কিছুতেই উচিৎ নয়। হ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাব- নিকাল লেখা এবং যেকোনো হস্ত শিল্প শিখতে পারে। (বরং বর্তমান সময়ে জরুরি) যাতে কখনো কোন অভিভাবক (পিতা, স্বামী, ছেলেও প্রমুখ) না থাকলে ইজ্জত - সম্মানের সাথে দু চার পয়সা উপার্জন করতে পারে। (ইসলাহে ইনকিলাব পৃ; ২৭০)

মেয়েদের শিক্ষা থেকে আমার উদ্দেশ্য 'এমএব, বিএ নয়। এমএ পাশ করে তারা এগুলো পড়ে কি করবে? তারা তো মেম।বিএ এরও প্রয়োজন নেই, নিজেই তো বিবি! আইএ এরও প্রয়োজন নেই।আজকাল মেয়েদের এমএ বিএ ডিগ্রিধারী বানানো একটা প্রথা হয়ে পরেছে। তারা কি চাকরি করবে যে, এত বড় বড় ডিগ্রি নিতে হবে। (আততাবলীগ, খন্ড ৭, পৃঃ৬২)

এই আধুনিক শিক্ষা --- শিক্ষা নয় ; বরং অজ্ঞতা। মহিলাদের জন্য এককেবারেই ধ্বংসাত্মক, অজ্ঞতার চেয়েও মারাত্মক, অজ্ঞতার মধ্যে এত ক্ষতি নেই, যত ক্ষতি এ শিক্ষার মধ্যে আছে। মহিলাদের শিক্ষার সময় হল শৈশবকাল, বর্তমানে শহরগুলোতে মেয়েদের শৈশবেই আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াতাদের শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে পরবর্তীতে অন্য কোন শিক্ষা তাদের পক্ষে ক্রিয়াশিল হয় না।যা সহজে প্রভাব ফেলে না মেয়েরা হল কাচা নরম লাকরির মতো, যেভাবে শুকানো হবে (অথাৎ বড় করা হবে, শিক্ষা দেওয়া হবে) সারাজীবন সেভাবেই কাজ করবে। কাজেই আধুনিক শিক্ষার নামে যে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে তা থেকে আমাদের দুরে থাকতে হবে।

৭.৬-ইসলামে নারী শিক্ষার বিধান :

নারীদেরকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইসলাম সব সময় উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বর্ণযুগে পর্দা করেও নারীরা ইলম অর্জনে অগ্রগামী ছিলেন। একদা কয়েকজন নারী

এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন,غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، 'আমাদের চেয়ে পুরুষরা আপনার নিকট বেশী সময় পেয়ে থাকে। অতএব আপনি আমাদের দ্বীন শিক্ষার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দেন। যেদিন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন ও নির্দেশনা প্রদান করতেন।[বুখারী হা/১০১]

ইসলামের নির্দেশনা হ'ল নারীদের আপদমস্তক আবৃত রাখা *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। কেননা পর্দা আমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত ও দৃষ্টিকে নত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। এখানে মুমিন নারী-পুরুষ সকলের জন্যই দৃষ্টি এবং যৌনাঙ্গের হেফাযতের মাধ্যমে পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ফলে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী পর্দার বিধান উপেক্ষিত হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। অতএব নারী-পুরুষ পৃথক অবস্থানে থেকে পর্দা রক্ষা করে শিক্ষা অর্জন করবে, এটাই ইসলামের চিরন্তন বিধান।

৭.৬ - আধুনিক শিক্ষা অশ্লীলতার প্রবেশদ্বার:-

ইসলাম হলো মহান আল্লাহ মনোনীত ধর্ম এবং সার্বিক সুস্থ্যতা ও সমাধানের একমাত্র নির্ভুল ও স্বচ্ছ পথপ্রর্দশক। সুস্থ্য উপায়ে বাঁচার গ্যারান্টিসহ সমস্ত জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা আছে একমাত্র ইসলামের কল্যাণকর জীবন বিধানে। কারণ ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাত মানব জাতির কল্যাণার্থে প্রেরিত হয়েছে। আর এই জীবন বিধানে যত প্রকার আদেশ নির্দেশ প্রদান করেছে তা যেমন মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রমাণ করেছে যে চিরস্থায়ী সাফল্যের যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, তেমন অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের এই পরিপূর্ণ সাফল্যের কারণেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পরিগণিত করা হয়।ইসলাম মানেই শান্তি। অর্থাৎ এর আইন কানূন, আদেশ, নিষেধ, অনূসরণ ও অনুকরণ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সর্বক্ষেত্রে সমাধান পূর্বক শান্তি এবং শৃংখলা বয়ে আনে যা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক, বিচার বিশ্লেষণসহ একটি পরীক্ষিত সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আজ আবারও আইয়্যামে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে মানব সমাজ বিশৃংখলতায় নিপতিত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীনযারা পথভ্রষ্ট ও ইসলাম ধর্ম থেকে বহির্ভূত প্রগতির নামে প্রহসনের কর্ণধার তাদের চিন্তা ধারায় প্রতিপালিত, সর্বদা 'আধুনিক সভ্যতা থেকে মুসলিমরা পিছ পা ও সেকেলের' এ রকম ইঙ্গিত করছে। আর এমনটাই ইসলামের প্রতি তাদের ধারণা। তারা এ সমস্ত নিকৃষ্ট কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের রূপকে বিকৃত করে

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি অশ্লীলতা মানুষ মস্তিষ্ককে বিকৃত করে উন্মাদ বানিয়ে নিলর্জ্জ করে চলেছে।

মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবণতা জন্মগত এক অতিব স্বাভাবিক প্রবণতা। আর এই লজ্জাশীলতা মানুষকে তার তাক্বওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা ও শালীনতা প্রবৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা মানুষকে আল্লাহভীতি থেকে বিরত রাখে ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে।যার ফলে মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়। শালীনতা ও অশালীনতার মধ্যে পার্থক্য ভুলে যায়। বিবেক নামের স্বচ্ছ যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এছাড়াও মানব শরীরের যে সকল অংশ নারী পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষন আছে, তা প্রকাশ্যে লজ্জা বোধের সাথে আচ্ছাদিত রাখার প্রচেষ্টা করা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বভাব। যদি কেউ তা না করে নির্লজ্জ বেহায়ার মত নিজের কুরুচি প্রকাশ করে, যা ইসলামী শরিয়তে গর্হিত কাজ তাই অশ্লীলতা। অবশ্য শয়তানের ইচ্ছা, যেন মানুষ লজ্জাকে পিছনে ফেলে নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করে। শয়তান মানুষকে এব্যাপারে প্ররোচিত করে এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন,فَ‘‘سْ‘‘سَ لَهُمَا الشَ-يْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ‘‘‘رِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَ‘‘أَتِهِمَا ‘অতঃপর শয়তান আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচিত করলো, যেন তাদের যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তা তারা উন্মুক্ত করে’ (সূরা আরাফ, ৭/২০)।

বর্তমান বিশ্বে নারীদেরকে পণ্য হিসাবে পরিগণিত করেছে। তথাকথিত সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতি ও প্রগতির ধ্বজাধারীরা ইসলামে অশ্লীলতা বিস্ফোরনে মূল উপাদান নারীদেরকে দেয়া মান সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাদেরকে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার ফলে নানা ধরনের নারী ঘটিত অপরাধ প্রবণতা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঘিœত হচ্ছে নারী জাতির নিরাপত্তা। প্রকোটভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা।

নারীদেরকে সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। নায়ক নায়িকাদের যৌন আবেদন মূলক অশ্লীল, অশোভন অভিনয়, নাচ-গান, বেহায়াপনা, স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দেহ প্রদর্শন করার ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুৎসিত চিন্তা চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে যুবসামজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারী জাতির এ বেহাল অবস্থা দর্শন করে সর্বস্তরের জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেছে নারীদেরকে মা বোনদের মত সম্মান করার মন মানসিকতা, তারা হারাতে বাধ্য হয়েছে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা। মানুষ কত নীচে নামতে পারে এবং তাদের নগ্নতা ও অশ্লীলতা কিভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা যায় তার প্রতিযোগীতা শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রীতা টেম্পিলটন নামে জৈনক মহিলা চার সন্তানের জননী পেশায় একজন লেখিকা। সে তার সন্তানদের নারী

শরীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দিতে নগ্ন হবেন তাদের সম্মূখে। নারী শরীরকে পণ্য করে তোলার প্রতিবাদে রীতার এই অভিনব ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছে বহু প্রগতিশীল মানুষ। হায়রে সমাজ ব্যবস্থা ভাবতে আবাক লাগে, যারা নারী জাতির বারোটা বাঁজিয়ে ছেড়েছে তারাই আবার নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য সভা-সমিতি করে আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত করে তুলছে নানা রকম ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে। নারীর আর কি মুক্তি চায় তারা? তারা তো তাদের দেশের নারীদেরকে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দিয়ে সর্বনাশের শেষ সীমায় নামিয়ে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে সাম্যের দিক বিবেচনা করে যে, নারী ও পুরুষ নৈতিক মর্যাদা এবং মানবীয় অধিকারের দিক দিয়ে শুধু সমান নয়, বরং পুরুষ যে কাজ করে নারীও তাই করবে। সাম্যের ভ্রান্ত ধারণার জন্য অফিস, আদালত কল কারখানার চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করে তাদের দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন ও গৃহের সু-ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলো নারীর কর্মসূচী হতে বাদ পড়ছে। তাদের প্রকৃতিগত কাজকর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে। সংসার জীবনের সুখ শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।কেনই বা হবে না? যে নারী নিজে উপার্জন করে যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, সে শুধু যৌন সম্ভোগের জন্য পুরুষের অধীন থাকবে কেন? এর ফলে পারিবারিক শান্তি না থাকায় তাদের জীবন তিক্ত হতে তিক্ততর হচ্ছে এবং একটি চিরন্তন দুর্ভাবনা তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিতে পারছে না। এটাই ইহলৌকিক জাহান্নাম যা লোকেরা তাদের নির্বূদ্ধিতা ও লোভ লালসার উন্মাদনায় ক্রয় করে নেয়।

জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ইধনবষ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন “পুরুষ ও নারী তো পশুর মতই। পশু দম্পত্তির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?”

সামাজিক নির্দেশের মধ্যে ইসলামের প্রথম কাজ নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করা এবং নারী পুরুষের জন্য সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারে আরব জাহিলিয়াতের যে অবস্থা ছিল বর্তমান জাতিগুলোর অবস্থা প্রায় অনুরূপ। তারা একে অপরের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় উলংগ হত, গোসল ও মল ত্যাগের সময় পর্দা করা তারা নি¯প্রয়োজন মনে করত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কা’বা ঘরের তাওয়াফ করত এবং একে তারা উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করত। নারীরাও তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে যেত। তাদের স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হত যে, বুকের কিছু অংশ, বাহু, কোমর এবং হাটুর নীচের কিছু অংশ অনাবৃত থাকত।এ অবস্থা ইউরোপ আমেরিকা এবং জাপানে দেখা যায়। শরীরের কোন অংশ অনাবৃত ও কোন অংশ আবৃত থাকবে তা নির্ধারণকারী সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,ارِي“يُ لِبَاسًا عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا قَدْ آَدَمَ يَا بَنِي رِيشًا” أَتِكُمْ“سَ ‘হে মানব সন্তান! আল্লাহ

তা‘আলা তোমাদের শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন এবং ইহা তোমাদের শোভাবর্ধক’ (সূরা আরাফ-৭/২৬)। নারী পর্দা করে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাবকে তেমনটি নয়। বরং শালিনতা বজায় রেখে নারীরা বাড়ীর বাহিরে কিভাবে চরাফেরা করবে সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَي-هَا الن-بِي- قُلْ لِأَزْ"اجِكَ "بَنَاتِكَ "نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن- مِنْ جَلَابِيبِهِن- تلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْتيْن ‘হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুসলিম নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন আপন চাদর দ্বারা নিজের ঘোমটা টেনে দেয়। এ ব্যবস্থার দ্বারা আশা করা যায় যে, তাদেরকে চিনতে পারা যাবে, অতঃপর তাদেরকে বিরক্ত করা হবে না’ (সূরা আহযাব-৩৩/৫৯)।

আল্লাহ তা‘আলা শরীয়তের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে মানুষের কার্যাবলী একটা নিয়ম শৃঙখলার অধীন হয়। আর এর মাধ্যমে সামাজের শালীনতা বজায় থাকে। পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা তথা ইসলামী জীবন বিধান ও চিন্তা চেতনা থেকে মানুষ বহু দূরে সরে যাওয়ার কারণেই মানব সভ্যতার আজ এ অধঃপতন। তাই আজ তারা (মানবতা) লাঞ্ছিত, অপমানিত, পদদলিত হচ্ছে পদে পদে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি পাশ্চাত্য তথা উন্নত বিশ্বকে ঐশ্বর্য দান করেছে, প্রচুর বিত্তশালী করেছে, কিন্তু ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য সুখ সামগ্রী তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। আজ বড়ই প্রয়োজন কুরআনকে গভীর ভাবে উপলদ্ধি করা ও রাসূলুল্লাল্লহ (ছা:)এর বাণীকে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ উজ্জ্বল আলোকে বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। মানব জাতির জন্য অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।যিনা ও অশ্লীলতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন," لَا تَقْرَبُ"ا الزِ-نَا إِن-هُ كَانَ فَا—شَةً "سَاءَ سَبِيلًا ‘তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ’ (সূরা আল-ইসরা-১৭/৩২)। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না, এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, " لَا تَقْرَبُ"ا الْفَ"ا—شَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "مَا بَطَنَ ‘লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক’ (সুরা আনআম-৬/১৫১)।

৭. ৮ উত্তরণের পন্থা ও করনীয় :-

নারীর উপর দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার এই ফরয আদায় করার বিভিন্ন পন্থার সাথে সাথে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য মহিলা মাদরাসায় অধ্যয়ন করাও সহজ একটা মাধ্যম। কেননা যদিও আমাদের পূর্বসূরীদের পন্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মেয়েদেরকে ঘরেই তালিম দান করত এবং নিজেরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বর্তমান বাবা—মায়েদের জন্য সেই ফুরসত হয়ে ওঠেনা, তাছাড়া বর্তমান বাবা—মায়েদেরও ঐরকম দ্বীনি জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেরাই থাকে

দিকভ্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর চলার জন্য যে ইলম অর্জন করা জরুরি, তার জন্য বর্তমানে মহিলা মাদরাসাগুলোর ভূমিকা অপরসীম।

বর্তমানে এই মাদরাসাগুলো নারীদের দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা দেশে এর শাখা–প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মেয়েরা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু বর্তমানে নারী জনসংখ্যার তুলনায় মাদরাসায় পড়োয়া নারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরদিকে বিশাল এক সংখ্যা রয়ে যাচ্ছে যারা স্কুল, কলেজ–ভার্সিটিসহ বিভিন্ন ধরণের সহশিক্ষা ও সহাবস্থানের পরিবেশে পড়াশোনা বা অবস্থান করছে। তারা যদিও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও দুনিয়াবি উন্নতি অর্জন করছে, কিন্তু দ্বীনি বিষয়ে এতটা অনবগত যে, দেখে দেখে কোরআন পড়তেও অক্ষম এবং নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়িলগুলো সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবগত। এমন নারীদের জন্যেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যান্ত জরুরি। চাই তা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক বা তাদের অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, অথবা কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বয়সের, প্রতিটি নারী–পুরুষের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে আশার বাণী হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও, সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ বা বাসা কেন্দ্রিক নারী–পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এটা আরো ব্যাপক ও সুশৃংখলতার সহিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্কুলগুলোতেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যতদিন পর্যন্ত খেলাফত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত অন্তত দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী ইলম বিস্তার করার ক্ষেত্রে সামাজিক বা ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগের বিকল্প নেই।

পরিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান করবো– আসুন! যেখানে যেখানেই এভাবে ছোট–বড় পরিসরে দ্বীনি শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই আমরা সকলেই এগিয়ে আসি এবং নিজের যোগ্যতা, অবস্থান ও সাধ্য অনুযায়ী তাতে সহযোগি হই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে দ্বীনি ইলম প্রচার–প্রসারের খেদমতে শামিল হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

উপসংহার :-

মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষা এমন এক দীপ্ত আলো, যা অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং তা

মনুষ্যত্বের বিকাশ, নৈতিকতার পরিপূর্ণতা এবং সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষা অর্জনের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়েছে। নারী শিক্ষা কেবল তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়; বরং একটি উন্নত ও নৈতিক সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসেবেও ইসলামে বিবেচিত। একজন শিক্ষিত নারী মানে একটি শিক্ষিত পরিবার, আর একটি শিক্ষিত পরিবার মানেই একটি উন্নত সমাজ। একজন মায়ের কোলে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের নেতা, আলেম, বিজ্ঞানী কিংবা নীতিবান নাগরিক। তাই নারী যদি শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হয়, তাহলে সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইসলাম নারীকে কেবল পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখেনি; বরং তাদের জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে।

নারী শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং তা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। শিক্ষা ছাড়া নারী যেমন তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না, তেমনি সমাজও তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই আজকের দিনে ইসলামি আদর্শে নারী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া, নারীদের জ্ঞান ও গৌরবে অভিষিক্ত করা এবং অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে একটি উন্নত, মানবিক ও আলোকিত সমাজ গঠন করাই আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। আসুন, আমরা ইসলামের আলোকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি এবং শিক্ষা দিয়ে প্রতিটি নারীকে করে তুলি সমাজের দীপ্তিমান নক্ষত্র।

মনে রাখতে হবে, নারীর কর্মক্ষেত্র তার গৃহ এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরে। উভয়ের সহযোগিতায় পরিবার শান্তিময় হবে। নারী হ'ল খেলার মাঠে গোলরক্ষকের মত। খেলোয়াড়রা সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়ায়। অথচ গোলরক্ষক গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকে। এক্ষণে যদি সে গোলপোস্ট ছেড়ে নিজেই স্ট্রাইকার হ'তে চায় ও মাঠের মধ্যে চলে যায়, তাহ'লে খেলার অবস্থা কেমন হবে? নারীকে ঘর ছেড়ে বাইরে পাঠালে ঘরের অবস্থা তেমনটি হবে। যা এখন হ'তে চলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পৃথিবীর সেরা নারী হ'লেন চার জন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে খাদীজা, (ফেরাউনের স্ত্রী) আসিয়া বিনতে মুযাহিম ও (ঈসার মা) মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ছহীহাহ হা/১৫০৮)। অতএব আমাদের মেয়েরা তাদের মত হৌক এবং কখনোই প্রগতির নামে অন্যদের পুচ্ছধারী না হৌক, সর্বান্তঃকরণে আমরা সেটাই কামনা করি- আমীন।

ইসলাম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। এই মহান দ্বীনের অনুশাসন নারী জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর স্পর্শে এনেছে। আজ সারা বিশ্বে নারী শিক্ষা আন্দোলন জেগে উঠেছে। নারী চায় সমাজে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার। ইসলামও নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে না বরং স্বাগত জানায়। পুরুষ জাতির পাশে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য নারী

জাতি শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে প্রবেশ করে। শিক্ষাঙ্গনে নারীর এই প্রবেশে ইসলাম বাধা দেয়নি।

এখন সারা মুসলিম জাহানে নারী তাদের ন্যায্য অধিকার প্রায় সাবলীলতার সঙ্গে ভোগ করছে। তারা সব রকমের বিদ্যা নিকেতনে সমাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞানর্জনে নিয়োজিত আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নারী জাতির যাতায়াত এখন প্রায় অবাধ। নারী এখন শিক্ষিকা, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স, সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক। নারী এখন তাদের কাজ পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাপন করার জন্য প্রস্তুত, শিক্ষাঙ্গনে নারীর স্বাভাবিক যাতায়াত নিশ্চিত না হলে সমাজের সর্ব প্রকার উন্নতিতে পুরুষকেই হাত লাগাতে হতো, ফলে তার এই প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবে কোনো দিনই সার্থকতা লাভ করতে পারতো না। ইসলামে নারীর এই স্বাধীনতা খর্ব করার নীতি নেই। নারী তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করবে এবং তার এই প্রবেশকে ইসলাম স্বাগত জানায়। তবে লজ্জাই নারীর ভূষণ। নারী যদি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সমাজের কাছ থেকে জোর করে তার অধিকার পেতে চায়, তবে ইসলাম তার এই কাজেই বাধ সাধবে। শালীনতা বিবর্জিত কোনো কাজই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম উদার নীতি পোষণ করে, কিন্তু এই উদারতার সুযোগ নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকে ইসলাম কঠোরভাবে সমালোচনা করে। শিক্ষা অন্বেষণের দোহাই দিয়ে কোনো নারীকেই তার শালীনতা ও সতীত্ব বিসর্জন দেওয়াকে কিছুতেই অনুমোদন করে না। শিক্ষার পবিত্র অন্বেষণকে ইসলাম সর্বদা উৎসাহ দিয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও দেবে।[ডা. মো: আজহার আলি: শিক্ষার ইতিহাস, পূবোক্ত,পৃ: ২১২]

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন মানুষ ইসলাম অনুসারী। অতীতের বিবেচনায় বিদ্যানিকেতনগুলোতে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শতকরা হারে শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মেয়েদের জন্য অনেক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এটা একটা আশাব্যঞ্জক নিদর্শন, সন্দেহ নাই। এই নিদর্শনের পবিত্রতা রক্ষিত হলে ইসলাম একে স্বাগত জানাবে। তবে পবিত্রতা রক্ষার অপারগতার পরিচয় দিলে ইসলাম একে কোনো দিনই অনুমোদন দিবে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা মাঝে মাঝে এমন কিছু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি যা ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না। ছেলেমেয়েদের শালীনতা বর্জিত মেলামেশা এমন একটি পর্যায়ে ঠেকেছে যে, শুধু ইসলাম কেন, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো ধর্মই একে অনুমোদন দিবে না। আমরা আশা করি, আমাদের নিরক্ষর জনসমুদ্র দ্রুত নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। তবে ইসলামী অনুশাসন যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার বান নিক্ষেপ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমাদেরকে সতর্কতার সাথে করতে হবে। ইসলামের সাম্য নীতি যাতে কোনো অশালীন প্রক্রিয়ার মাঝে বিলীন হয়ে না যায়, তার ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে

হবে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এ সত্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।[প্রাগুক্ত ; পৃ:২১৩]

শরীয়তের অনুমোদিত উপায়ে 'জেন্ডার বৈষম্য' মুক্ত হয়ে মানব সম্পদের এই বৃহৎ অংশ নারী জাতির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রয়াস ইসলাম গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও তৎপরতাকে ইসলাম কল্যাণকর মনে করেছে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন ইসলামের একান্ত কাম্য।

যুগের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে এবং তাদেরকে ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে সারা দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদ্রাসা ও মহিলাদের জন্য সতন্ত্র সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন, যেগুলো মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে।[প্রিন্সিপাল মাওলানা আকবর হোসেন,বেগম নূরজাহান ; পূর্বোক্ত পৃ :১৩]পরিশেষে সবাইকে, বিশেষ করে বিদূষী নারী সমাজের প্রতি আহবান জানাচ্ছি জ্ঞানের পথে এগিয়ে আসতে হবে এবং স্ব-স্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে ও ইসলামী বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইসলামকে Uplift করতে। সবাই যেন Brightest Star হবার চেষ্টা করি।